বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

একচল্লিশতম খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদক
এস এম মাহফুজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক জেড এন তাহমিদা বেগম
সম্পাদক	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার
		অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার
		অধ্যাপক আরিফা সুলতানা

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor S M Mahfuzur Rahman, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রায়োগার্থিক বিশ্লেষণ
খন্দকার খায়রুন্নাহার ১৬৭

***মধ্যমব্যায়োগ* নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিকাভিনয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ**
কাজী তামান্না হক সিগমা ১৮৯

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান ও করণীয়
লুৎফুন্ নাহার ২০৯

সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
তানভীর আহমেদ ২২৫

পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯২১-১৯৭০ : নারীর সাংগঠনিক কর্মপ্রয়াস
হোসনে আরা ২৫৩

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প : আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনার রূপায়ণ
কামরুন নাহার ২৭৭

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:
   - বাংলা বিজয় সফট্ওয়্যারের সুতন্বি-এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধটির মোট শব্দসংখ্যা ৩০০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে সীমিত হতে হবে;
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ১.৫ ইঞ্চি, নিচে ১.৫ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৫. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৮. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৯. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

১০. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১১. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১২. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে:

(ক) প্রবন্ধের শিরোনাম, (খ) সারসংক্ষেপ, (গ) চাবি শব্দ, (ঘ) সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২২ ও ২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক এমিরিটাস খন্দকার বজলুল হক
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক সাজাহান মিয়া
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মো: লুৎফর রহমান অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম অধ্যাপক আরিফা সুলতানা অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী অধ্যাপক সুরাইয়া আক্তার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রায়োগার্থিক বিশ্লেষণ

খন্দকার খায়রুন্নাহার*

সারসংক্ষেপ

প্রায়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics) অন্তর্ভুক্ত বিষয় বিনম্রতাকে (politeness) সামাজিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। সামাজিক সংজ্ঞাপনের অংশ হিসেবে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপনকর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) এবং বিনম্রতা (politeness) এই দুইটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ, যা পৃথিবীর প্রতিটি ভাষিক সমাজের দাওয়াতপত্রে উপস্থিত থাকে। বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে যে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপনধর্মী বাককৃতি রয়েছে তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং বিনম্রতার স্বরূপ ও প্রকৃতি কীভাবে এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ: বাংলা ভাষা, দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র, বিনম্রতা, বাককৃতি, প্রায়োগার্থিক বিশ্লেষণ, প্রস্তাবকৃতি।

১. ভূমিকা

সামাজিক জীব হিসেবে যোগাযোগের মাধ্যম রূপে মানুষকে যেমন ভাষার ব্যবহার করতে হয়, একই সাথে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি সম্পর্কেও তাকে সচেতন থাকতে হয়। ভাষার প্রায়োগিক বিভিন্ন রীতি-নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনম্রতা (politeness) এবং বাককৃতি (speech act)। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিনম্রতার ব্যবহার মানব সমাজে লক্ষণীয়। লিচ (Leech)-এর মতে চীনা ভাষিক সমাজে দুই হাজার বছরের অধিককাল আগে থেকে বিনম্রতা প্রচলিত।[১] বিনম্রতা নিয়ে প্রায়োগার্থবিজ্ঞানী, সমাজভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের বেশ কিছু গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয় বলে লিন (Lin) উল্লেখ করেছেন।[২] প্রায়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গত চার দশক ধরে বিনম্রতা (politeness) এবং অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) আলোচিত হচ্ছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনম্রতা এবং বাককৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করি। এইসব উক্তি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে। উক্তির এই বৈশিষ্ট্যকে অস্টিন (Austin) বাককৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩] বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি, যেমন-প্রশংসা করা, অনুরোধ করা, শুভেচ্ছা জানানো, আমন্ত্রণ জানানো, আদেশ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনম্রতার সুস্পষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতিভেদে বিনম্রতার প্রকাশ ভিন্ন হলেও প্রতিটি ভাষিক সমাজে বাককৃতি

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং বিনম্রতার সহাবস্থান রয়েছে। দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়, এই কারণে দাওয়াতপত্রের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাই দাওয়াতপত্রে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি এবং ভাষিক উপাদান সমৃদ্ধ বিনম্রতার ব্যবহার অপরিহার্য। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষিক সমাজে দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে এই বিষয় দুটি থাকে। বাংলা ভাষায় লিখিত অফিস-আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রতিফলন এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে।

২. দাওয়াতপত্র ও দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র

দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সাধারণত কাউকে কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিভিন্ন অভিধানে দাওয়াতপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে 'a written or spoken request to come somewhere or do something or the act of inviting someone' (Cambridge Dictionary)[৪].

'an invitation is a written or spoken request to come to an event such a party, a meal or a meeting' (Collins English Dictionary) ।[৫] আমন্ত্রণ জানানোর পেছনেও কিছু কারণ রয়েছে, যেমন-নতুন সম্পর্ক তৈরি করা এবং তা রক্ষা করা, সামাজিক যোগযোগ স্থাপন করা, তথ্য প্রদান করা, স্মৃতিতে ঐ অনুষ্ঠান রেখে দেওয়া ইত্যাদি। কোনো অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য, যেমন-কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা উল্লেখ থাকে। এতে করে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রতিটি ভাষিক সমাজে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুসারে দাওয়াতপত্র প্রচলিত। প্রায়োগিকতা অনুসারে বাংলা ভাষায় লিখিত ও প্রচলিত দাওয়াতপত্রসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-পারিবারিক দাওয়াতপত্র, ধর্মীয় দাওয়াতপত্র, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাওয়াতপত্র, দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র এবং একাডেমিক দাওয়াতপত্র। বিভিন্ন দপ্তরে অনুষ্ঠান বা দিবস উদযাপনের জন্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র প্রচলিত। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ, প্রতিষ্ঠা বার্ষিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দিনে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৩. তত্ত্বগত বিবেচনা

উক্ত প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রায়োগার্থিক বিশ্লেষণে দুই ধরনের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, বিনম্রতা তত্ত্ব (politeness theory) এবং দ্বিতীয়ত, বাককৃতি তত্ত্ব (speech act theory)।

৩.১ বিনম্রতার তত্ত্ব

Politeness-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বিনম্রতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হুয়াং (Huang) এর মতে বিনয়ী হওয়ার অর্থ মূলত একটি ভাষিক সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।[৬] বিনম্রতার তত্ত্বে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের দৈনন্দিন মিথক্রিয়ায় ব্যবহৃত নিয়মাবলির প্রতিফলন ঘটে থাকে। বিনম্রতার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে গ্রাইসিয়ান রীতি (Gricean maxim), ল্যাকফের বিনম্রতার রীতি (Lakoff's rules of politeness), ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson's politeness strategies), লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech's model of politeness), ইডির বিনম্রতার রীতি (Ide's politeness principle)। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য এখানে মূলত ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল (Brown and Levinson's politeness strategies) এবং লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech's model of politeness) অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.১.১ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার কৌশল

ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson) ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন বিনম্রতা-বিষয়ক তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ *politeness: Some universal in language usage* গ্রন্থটি। তাঁরা এই গ্রন্থে বিনম্রতার যে তত্ত্ব প্রস্তাব করেন সেটি প্রায়োগার্থবিজ্ঞানে সার্বজনিক বিনম্রতার তত্ত্ব নামে সুপরিচিত বলে হাকিম আরিফ উল্লেখ করেছেন।[৭] তাঁরা মূলত অভিব্যক্তি (face), ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness), অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (face threatening act বা FTA) এবং বিনম্রতার কৌশল (politeness strategies) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজস্ব অভিব্যক্তি (face) রয়েছে। একে তাঁরা ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৮] চীনা ভাষাবিজ্ঞানী গু (Gu) অভিব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করাকে ব্যক্তিগত বিষয় অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।[৯] বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিব্যক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাঁধাস্বরূপ হয় বা এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করে থাকে যাকে ব্রাউন ও লেভিনসন অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (face threatening act বা FTA) বলেছেন।[১০] ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown and Levinson) তাঁদের তত্ত্বে দুই ধরনের বিনম্রতার কথা বলেছেন, যথা-ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness) এবং নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness)। এই দুই শ্রেণির বিনম্রতার ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ কয়েকটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিবাচক বিনম্রতা যেমন-প্রশংসা করা, অভিনন্দন জ্ঞাপন, সৌহার্দ্য দেখানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রাউন ও লেভিনসন ১৫ ধরনের কৌশল নির্ধারণ করেন (Brown and Levinson; উদ্ধৃত, আরিফ)।[১১] এগুলো হলো:

১। শ্রোতাকে খেয়াল করা, মনোযোগ দেওয়া (তাঁর আগ্রহ, প্রয়োজন, চাওয়া এবং সম্পত্তি) Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods)

২। বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার কৌতূহল, অনুমোদন এবং সহানুভূতি) Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)
৩। শ্রোতার কৌতূহলকে তীব্রতর করা (Intensify interest to H)
৪। দলভুক্ত পরিচয়কে সূচিত করা (Use in-group identity markers)
৫। মতৈক্য অন্বেষণ (Seek agreement)
৬। মতানৈক্য এড়ানো (Avoid disagreement)
৭। অভিন্ন ভিত্তিকে অনুমান/উত্থাপন/ঘোষণা করা (Presuppose/raise/assert common ground)
৮। তামাশা (Joke)
৯। শ্রোতার প্রত্যাশা বিষয়ে বক্তার যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে পূর্বানুমান করা (Assert or presuppose S's knowledge of concern for H's wants)
১০। প্রস্তাব দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া (Offer, promise)
১১। আশাবাদী হওয়া (Be optimistic)
১২। কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা (Include both S and H in the activity)
১৩। যুক্তি প্রদান করা বা যুক্তি প্রত্যাশা করা Give (or ask for) reasons
১৪। পারস্পরিকতা বিষয়ে অনুমান করা বা ঘোষণা করা (Assume or assert reciprocity)
১৫। শ্রোতাকে উপহার প্রদান (দ্রব্য, সহানুভূতি, বোঝাপড়া, সহযোগিতা) Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, cooperation)।

যেকোনো ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বা আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে নেতিবাচক বিনম্রতা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। নেতিবাচক বিনম্রতা যেমন-অনুরোধ করা, আমন্ত্রণ জানানো, আদেশ করা ইত্যাদি চরিতার্থতা করার জন্যও ব্রাউন এবং লেভিনসন ১০ ধরনের কৌশল শনাক্ত করেছেন (Brown and Levinson; উদ্বৃত, আরিফ)।[১২] এগুলো হলো:

১। স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া (Be conventionally indirect)
২। প্রশ্ন, রক্ষাকবচ (Question, hedge)
৩। নিরাশ হওয়া (Be pessimistic)
৪। হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা (Minimize the imposition, R)
৫। ভিন্নধর্মী হওয়া (Give deference)
৬। ক্ষমা চাওয়া (Apologize)
৭। বক্তা-শ্রোতাকে নিরপেক্ষ করা: 'আমি' এবং 'তুমি'র ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া (Impersonalize S and H: Avoid the pronouns 'I' and 'you')
৮। অকিঞ্চিৎকর হওয়া (State the FTA as a general rule)
৯। সম্মান দেওয়া (Nominalize)

১০। বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া, শ্রোতাকে অকৃতজ্ঞ না করা/ভাবা (Go on record as incurring a debt, or as not indebting H)

ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) তত্ত্বমতে বিনম্রতার সাথে দুইটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। একদিকে অভীক (FTA) হ্রাস করা অন্যদিকে অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করা। নেতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে বক্তা অনুরোধের মাধ্যমে বা পরোক্ষভাবে শ্রোতাকে তার মনোগত অভিপ্রায় সম্পর্কে বলেন জন্য এধরনের বিনম্রতার ক্ষেত্রে অভীক (FTA) হ্রাস পায়। ইতিবাচক বিনম্রতার বক্তার উদ্দেশ্য থাকে নিজের সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা শ্রোতার মনে রয়েছে তা যেন বর্তমান থাকে বা বৃদ্ধি পায়। ইতিবাচক বিনম্রতায় তাই অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি পায়।

৩.১.২ লিচের বিনম্রতার রীতি

গ্রাইসের (Grice) সহযোগী রীতি (Co-operative principle, CP) এর ওপর ভিত্তি করে লিচ (Leech) বিনম্রতার রীতি প্রস্তাব করেছেন। কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুস্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ রীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে লিচ (Leech) মনে করেন।[১৩] লিচ নির্দেশিত ৬টি রীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা

যায় বক্তা নিজেকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর করে শ্রোতাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করে। যেমন- বিচক্ষণ রীতির (tact maxim) ক্ষেত্রে শ্রোতার সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। উদারতা রীতিতে (generosity maxim) বক্তা নিজের সুবিধা হ্রাস করেন। অনুমোদিত রীতিতে (approbation maxim) শ্রোতার সম্মানকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মিতচারিতা রীতি (modesty maxim) অনুসারে বক্তা নিজেকে তুচ্ছ করে শ্রোতাকে সম্মানিত করে। চুক্তিবদ্ধ রীতিতে (agreement maxim) বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার মতানৈক্য হ্রাস পায় এবং সহানুভূতি রীতিতে (sympathy maxim) বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৩.২ বাককৃতি তত্ত্ব

মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা এবং তা রক্ষা করা। আরিফ (Arif) এর মতে এখানে যোগাযোগ বলতে মূলত ভাববিনিময় যোগ্যতাকে বোঝাচ্ছে।[১৪] ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন (Austin) ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বাককৃতি (speech act) উপস্থাপন করেন ।[১৫] তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাককৃতি বিষয়ে যে ভাষণ দিয়েছেলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি একত্রিত করে *How to Things With Words* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অস্টিনের (Austin) বাককৃতি তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে সেটিকে আরো বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেন সার্ল (Searle)। বাককৃতিকে সার্লই প্রথম মানুষের মনোগত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে মনোস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। কথা বলার সময় বক্তা শুধুমাত্র কিছু উক্তিই উচ্চারণ করে না, এগুলির মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রভাবিতও করে।

তাই সার্ল (Searle) এর মতে ভাষা বলার অর্থই বাককৃতি।[১৬] আমাদের প্রতিটি উক্তির পেছনে অভিপ্রায় (intention) কাজ করে। অভিপ্রায়মূলক বাককৃতি ভাষিক যোগাযোগ সফল করতে মূল ভূমিকা পালন করে। এ কারণে সার্ল (Searle) মনে করেন অভিপ্রায় (intention) বাককৃতির জন্য অপরিহার্য। বাককৃতি সম্পন্ন করার জন্য তিনি ৩টি সহকৃতির উল্লেখ করেছেন, যেমন- প্রস্তাব কৃতি (propositional act), নিবেদন কৃতি (illocutionary act) এবং প্রতিক্রিয়া কৃতি (perlucationary act)। যে কোন উক্তি বা বাক্য, যার মাধ্যমে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংজ্ঞাপন শুরু হয় তাই প্রস্তাব কৃতি (propositional act)। যেসব উক্তির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কাজের ধারণা প্রকাশ করি, যেমন-আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ইত্যাদির পেছনে আমাদের যে অভিপ্রায় (intention) কাজ করে তাই নিবেদন কৃতি (illocutionary act)। নিবেদন কৃতির অভিপ্রায় (intention) প্রস্তাব কৃতির মূল বিষয় হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ উক্তির অন্তরালের এই অভিপ্রায় (intention) সার্লের (Searle) ভাষিক দর্শনের মূল উপাদান। সার্ল (Searle) নিবেদন কৃতিকে (illocutionary act) ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন ।[১৭] বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির (representatives) মাধ্যমে বক্তা প্রচলিত কোনো বিষয় শ্রোতাকে অবহিত করেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির (directives) মধ্যে রয়েছে আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, প্রশ্ন, অনুরোধ, আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতাকে কোনো কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির (commissives) মাধ্যমে বক্তা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার জন্য শ্রোতার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হন। প্রতিজ্ঞা করা, প্রত্যাখ্যান করা, হুমকি দেওয়া এই শ্রেনিভুক্ত। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে (expressives) বক্তার আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক প্রপঞ্চ প্রকাশ পায়। অভিনন্দন জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, প্রশংসা করা প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি। ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতির (declaratives) ক্ষেত্রে বক্তার অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। কাউকে মনোনীত করা, বহিষ্কার করা, যুদ্ধঘোষণা করা ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্গত। প্রতিক্রিয়া কৃতি (perlucationary act) শ্রোতা ব্যবহার করেন বক্তার অভিপ্রায় (intention) পূরণের উদ্দেশ্যে। আরিফ (Arif)-এর মতানুসারে বলা যায়, বক্তার বাককৃতির সাফল্য নির্ভর করে শ্রোতার ত্রুটিহীন প্রতিক্রিয়ার ওপর।[১৮] সার্ল (Searle) প্রতিক্রিয়া কৃতিকে মানবীয় যোগাযোগের সর্বশেষ ধাপ বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রায়োগার্থিক বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) ব্যবহার করা হয়েছে। গৃহীত তত্ত্ব দুটির আলোকে দাওয়াতপত্রসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দাওয়াপত্রসমূহের ভাষাগত, অনুষঙ্গগত এবং প্রায়োগিক দিককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এখানে দাপ্তরিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লিখিত

দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা পর্যালোচনা তথা এক ধরনের নথি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এটি গুণগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কৌশল বলে বিবেচনা করা যায়।

৪.১. গবেষণা উদ্দীপক

এই গবেষণাকর্মে উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র। এক্ষেত্রে মোট ২৭টি দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২. উপাত্ত সংগ্রহ প্রণালি

গুণগত পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র বা উদ্দীপক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতার প্রতি এক ধরনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই 'অনুরোধ জ্ঞাপন' এক ধরনের বাককৃতি। আবার আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে দাওয়াতপত্র প্রণয়ন করেন বলে প্রতিটি দাওয়াতপত্রেই সচেতনভাবে আমন্ত্রণকারী বিনম্রতাসূচক শব্দচয়ন করা থাকেন। গবেষণার জন্য গৃহীত দাওয়াতপত্রসমূহে বিনম্রতা ও বাককৃতির সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে গবেষণাকর্মে গৃহীত দাওয়াতপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বিনম্রতা ও বাককৃতির মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য ব্রাউন ও লেভিসন (Brown and Levinson) এবং লিচ (Leech) এর বিনম্রতার তত্ত্ব এবং সার্ল (Searle) এর বাককৃতি তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে।

৫. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রসমূহের উক্তিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই শ্রেণির দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। উক্ত গবেষণায় গৃহীত ২৭ টি দাপ্তরিক

দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষণ করে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথক করা হয়েছে। নিচে তা উপস্থাপিত হলো:

সারণি ১: নির্বাচিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১৭	
২	প্রিয় সহকর্মী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	

৩	মহামান্য	সম্মান দেওয়া		২
৪	সম্মাননীয়	সম্মান দেওয়া		১
৫	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১
৬	প্রখ্যাত	সম্মান দেওয়া		১
৭	শুভেচ্ছা	শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা	১	
৮	প্রিয় মহোদয়	শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা	২	
৯	মহোদয়	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
১০	মাননীয়	সম্মান দেওয়া		১৫
১১	সম্মানিত অতিথি	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১০	
১২	সম্মানিত সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৩	
১৩	উপস্থিতি কামনা করছি	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		১
১৪	সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি	সম্মান দেওয়া		১৩
১৫	অনুরোধ জানাই	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		২
১৬	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১৩
১৭	আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৫
১৮	সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১
১৯	অনুপ্রাণিত করবে	হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা		৩
২০	সানুগ্রহ উপস্থিতি	সম্মান দেওয়া		২
২১	গভীর শ্রদ্ধা	সম্মান দেওয়া		২
২২	সবিনয় অনুরোধ	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২৩	লোকান্তরিত আত্মা	সম্মান দেওয়া		১
২৪	শান্তি লাভ করুক	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		১
২৫	বিনয় সম্ভাষণান্তে	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
২৬	বিনীতভাবে কামনা করছি	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
২৭	ধন্যবাদান্তে	ব্যক্তি হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩
২৮	ধন্যবাদ ও আন্তরিকতাসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		১

২৯	বিনীত	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		২
৩০	বিনয়াবনত	অকিঞ্চিৎকার হওয়া		৩
৩১	সনির্বন্ধ	সম্মান দেওয়া		১
৩২	ধন্যবাদসহ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৭
৩৩	সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন	সম্মান দেওয়া		১
			৩৮	৮৮

ব্রাউন এবং লেভিনসনের (Brown and Levinson) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশল অনুসারে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা পর্যালোচনা করে দেখা যায় এতে ৩৮টি ইতিবাচক এবং ৮৮টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে মোট ১২৬টি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সে হিসেবে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৩০ ভাগ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ ৭০ ভাগ। নিচের চিত্রে তা উল্লেখ করা হলো।

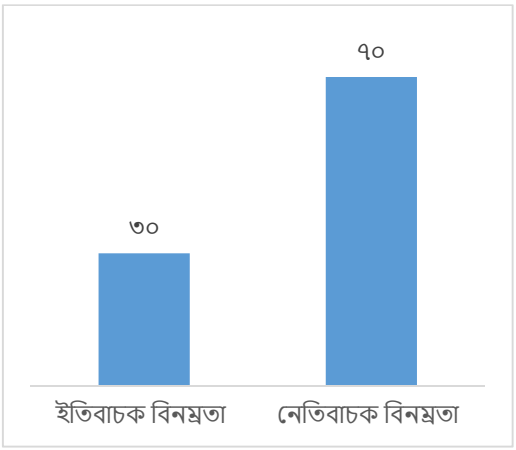

চিত্র ১. দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৫.১. নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে গৃহীত দাওয়াতপত্রসমূহ থেকে নমুনা হিসেবে দুইটি দাওয়াতপত্রের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এগুলোতে প্রতিফলিত বিনম্রতা ও বাককৃতির প্রয়োগার্থিক তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য।

৫.১.১ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-১

দাপ্তরিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতপত্রটি নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে সংযোজিত হলো।

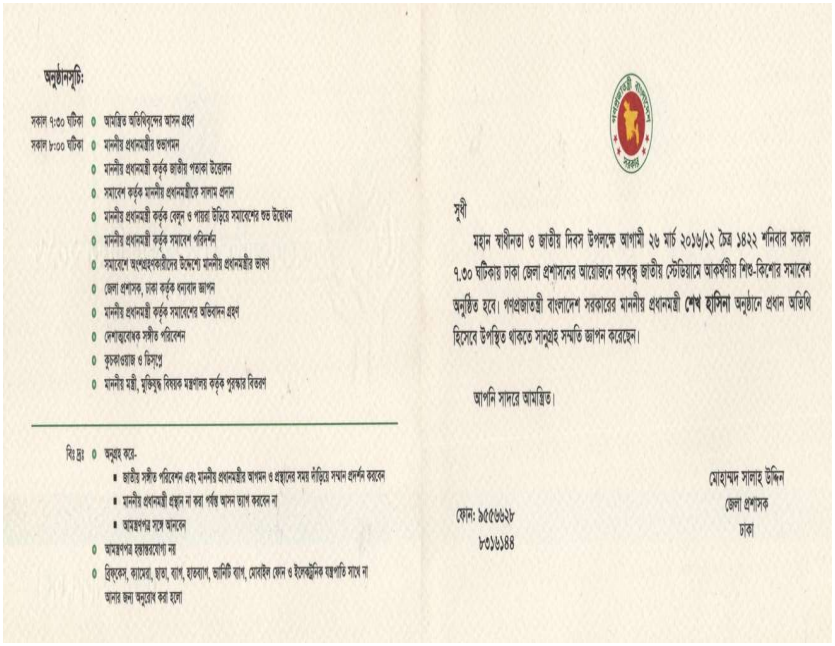

অনুষ্ঠানসূচি:

সকাল ৭:৩০ ঘটিকা ০ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
সকাল ৮:০০ ঘটিকা ০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভাগমন
০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন
০ সমাবেশ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদান
০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের শুভ উদ্বোধন
০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমাবেশ পরিদর্শন
০ সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
০ জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন
০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমাবেশের অভিবাদন গ্রহণ
০ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন
০ কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে
০ মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ

বিঃ দ্রঃ ০ অনুগ্রহ করে-
- জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবেন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্থান না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না
- আমন্ত্রণপত্র সঙ্গে আনবেন

০ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়
০ ব্রিফকেস, ক্যামেরা, ছাতা, ব্যাগ, হাতব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হলো

সুধী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আগামী ২৬ মার্চ ২০১৬/১২ চৈত্র ১৪২২ শনিবার সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আকর্ষণীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আপনি সাদরে আমন্ত্রিত।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক
ঢাকা

ফোন: ৯৫৫৬৬২৮
৮৩১৬১৪৪

চিত্র ২. বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

৫.১.২ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। ফলে এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত অতিথিবৃন্দকে দাওয়াতপত্র প্রেরণ করে থাকেন। আলোচ্য দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণগ্রহিতাদের উদ্দেশ্য করে, যেমন- 'সুধী', 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত' প্রভৃতি। আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাঁকে সম্মান জানিয়ে সম্মানসূচক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। এতে করে আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে আমন্ত্রণগ্রহিতাও সম্মানিতবোধ করেন। তাই আলোচ্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটিতে আমন্ত্রণকারী

আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) ধারণাসূচকে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। মূলত 'সুধী' সম্বোধনের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আমন্ত্রণকারী। এর মাধ্যমে তিনি নিজের অভিব্যক্তিও (face) বৃদ্ধি করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির নিকট।

দাপ্তরিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম বা বিশেষ কোন দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজ বা রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে রীতি অনুসারে 'প্রধানমন্ত্রী'-এর পূর্বে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাননীয়' শব্দটি বিশিষ্ট ব্যক্তির পদবির পূর্বে ব্যবহার করে রীতি অনুসারে 'পদবি' কে সম্মান প্রদর্শন করেছেন আমন্ত্রণকারী। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন' বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায়, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'। এ কারণে তাকে সম্মান জানিয়ে 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া 'সাদরে আমন্ত্রিত' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার জন্য 'অনুরোধ' করেছেন। দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত' শব্দ/বাক্যাংশ ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্বমতে নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। কেননা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহারে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মান বৃদ্ধি পায় একইসাথে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তির ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। কারণ আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অপ্রত্যক্ষরূপ বা অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি অতিথিকে জোর করছেন না। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১.৩ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

বিশ্লেষিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটির (মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত) উক্তিমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ৫টি অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো iv) আমন্ত্রণকারীর পদবিসহ নাম এবং v) যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের এই পাঁচটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে প্রদত্ত হলো।

সারণি ২: দাপ্তরিক (মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্র. নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষ্যে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি অয়োজন করা হয়েছে, প্রধান অতিথি হিসেবে কে উপস্থিত থাকবেন প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য	তথ্য বা বিষয়বস্তু বর্ণনা
৩	সাদরে আমন্ত্রিত	অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ
৪	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	পদবিসহ আমন্ত্রণকারীর নাম
৫	টেলিফোন নাম্বার	কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য

বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রটির বিভিন্ন ভাষিক উপাদানসমূহ (সারণি ২) যা সার্লের (Searle) তত্ত্ব অনুসারে প্রস্তাব কৃতি নামে পরিচিত তার শুরুতেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেছেন 'সুধী'। আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক বা বিধিগত পরিবেশে কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীকে সম্বোধনের জন্য এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। দাওয়াতপত্রের পরবর্তী অংশে রয়েছে দাওয়াত সংক্রান্ত তথ্য বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা। দাওয়াতপত্রের এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেন, যেমন- কী উপলক্ষ্যে, কবে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কে হবেন প্রভৃতি। তৃতীয় কাঠামোগত অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরবর্তী অংশে দপ্তর প্রধান হিসেবে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম, পদবি উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে কয়েকটি ফোন নাম্বার রয়েছে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য।

দাওয়াতপত্রটির কাঠামোগত অংশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় অংশটি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা এর মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের (Searle) তত্ত্ব অনুসারে আমাদের উক্তির মধ্য দিয়ে কাজ নির্দেশিত হয়।[১৯] সে হিসেবে দাওয়াতপত্রটির লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশিত হয়েছে যাতে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় পাঠকের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। সার্লের (Searle) মতে এই 'মনোগত অভিপ্রায়' হলো 'নিবেদন কৃতি'।[২০] এই দাওয়াতপত্রের নিবেদন কৃতি হলো আমন্ত্রণগ্রহণকারী যেন উল্লিখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। প্রস্তাব কৃতির 'মহান স্বাধীনতা .... সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন' অংশটুকু বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। এ অংশে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু বিবৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী অংশ 'আপনি ..... আমন্ত্রিত' এই প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সার্লের (Searle) তত্ত্ব অনুসারে এই অংশটুকু 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। এখানে অনুরোধের মাধ্যমে

আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন' অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতি, কারণ এই অংশের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করা নির্দেশ করছে।

বক্তা-শ্রোতা, লেখক-পাঠক বা আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার সমন্বিত প্রয়াসে কোন সংজ্ঞাপন সাফল্য লাভ করে। আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা থাকতে না পারলে তা জানিয়ে দেন তাহলে সার্লের (Searle) মতে প্রতিক্রিয়া কৃতি সুসম্পন্ন হয়।[২১] সার্ল (Searle) এর বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে বলা যায়, এই দাওয়াতপত্র প্রণয়নকারী বা আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন মূলত আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, এই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে অতিথিকে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। প্রস্তাব কৃতির মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি বা আমন্ত্রণকারীর 'অনুরোধ' প্রকাশ পেয়েছে । এই দাওয়াতপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি আমন্ত্রণকারীর লিখিত আহবানে সাড়া দিয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে।

৫.২ দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

এই গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণের জন্য দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ভাষা পদযাত্রা' অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র গৃহীত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপিত হলো:

ভাষা পদযাত্রা ২০১৯

সুধী

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা-র পাদদেশ থেকে ভাষা পদযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন ঘোষণা এবং নেতৃত্ব প্রদানে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ভাষা পদযাত্রায় আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদসহ

ড. সালমা নাসরীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্র ৩. বিশ্লেষিত দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

৫.২.১ ব্রাউন ও লেভিসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক দাওয়াতপত্র সাধারণত ঐ দপ্তর প্রধান কর্তৃক প্রেরিত হয়। সে হিসেবে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান 'ভাষা পদযাত্রা'র দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে 'সুধী', 'মাননীয়', 'গভীর শ্রদ্ধা', সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' প্রভৃতি।

আমাদের সংস্কৃতিতে আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে অতিথিকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উদ্দেশ্য করে 'সুধী' সম্বোধন করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। কারণ 'সুধী' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করেছেন।

দাপ্তরিক অনুষ্ঠানমালা রীতি অনুসারে সাধারণত বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন একটি পর্বের উদ্বোধন করে থাকেন। 'ভাষা পদযাত্রা'র অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উপাচার্য' উদ্বোধন করবেন, এ কারণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে রীতি অনুসারে 'উপাচার্য' এর পূর্বে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাননীয়' শব্দটি বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিবর্গের পদবির পূর্বে ব্যবহার করে তাঁর পদবিকে রীতি অনুসারে 'সম্মান' জানানো হয়েছে। এই দাওয়াতপত্রে 'গভীর শ্রদ্ধা', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' শব্দ/বাক্যাংশসমূহের প্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী 'গভীর শ্রদ্ধা' জ্ঞাপন করেছেন ভাষা শহিদের প্রতি। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 'গভীর শ্রদ্ধা' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভাষা পদযাত্রা'র অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উদ্বোধন করতে এবং নেতৃত্ব দিতে সম্মত হয়েছেন বিধায় তাঁকে সম্মান জানিয়ে 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে প্রয়োগ করেছেন। অতিথি যেন আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধ না করেন বা মনোক্ষুণ্ন না হন, সেজন্য এই বাক্যাংশগুলো ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রণকারী। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে 'মাননীয়', 'গভীর শ্রদ্ধা', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা', 'ধন্যবাদসহ' শব্দ/বাক্যাংশসমূহ নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের ব্যবহারে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মান যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনিভাবে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। কারণ আমন্ত্রণকারী এক্ষেত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে আমন্ত্রণের

ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) তত্ত্ব অনুসারে দাওয়াতপত্রে এ দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২.২ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রটির (ভাষা পদযাত্রা) উক্তিমালা লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে ৪টি অংশ রয়েছে, যথা- i) সম্বোধন ii) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা iii) আমন্ত্রণ জানানো এবং iv) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমন্ত্রকারীর নাম। একটি দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের এই চারটি অংশে কোন ধরনের ভাষিক উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি ৩: দাপ্তরিক (ভাষা পদযাত্রা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	সুধী	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন
২	কী উপলক্ষে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে এবং কে উদ্বোধন করবেন প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাবলী	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা
৩	উপস্থিতি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ
৪	ধন্যবাদসহ	আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক আমন্ত্রণকারীর নাম ও পদবি

উল্লেখ্য, দাওয়াতপত্রটির প্রস্তাব কৃতির প্রথমেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করে 'সুধী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কোন অতিথিকে সম্বোধনের জন্য এরূপ সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী অংশে রয়েছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। এ অংশে দাওয়াতকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন, যেমন- কখন, কোথায়, কী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে, কে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করবেন প্রভৃতি। তৃতীয় ভাষিক কাঠামোগত অংশে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রস্তাব কৃতির শেষ অংশে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতপত্রের উল্লিখিত কাঠামোগত চারটি অংশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। কারণ এ অংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতা সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের (Searle) তত্ত্বমতে আমাদের ব্যবহৃত কথা বা লেখনির মাধ্যমে কাজ নির্দেশিত হয়।[২২] দাওয়াতপত্রটির লিখিত বক্তব্যের

মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশিত হয়েছে যা সার্লের তত্ত্ব অনুসারে 'নিবেদন কৃতি'। এই দাওয়াতপত্রটির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা বা নিবেদন কৃতি হলো আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো। দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির 'গভীর শ্রদ্ধার ..... অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান' অংশটি বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে আমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বিবৃতি বা সাধারণ কিছু তথ্য দিয়েছেন। পরবর্তী অংশ 'ভাষা পদযাত্রায় ..... আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি' এই প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। উপরিউক্ত প্রস্তাব কৃতির সাহায্যে আমন্ত্রণকারী আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সার্ল (Searle) এই অংশটুকুকে বলেছেন 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'।[২৩] কারণ এখানে 'অনুরোধের' মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সবশেষে 'ধন্যবাদসহ' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, এই অংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

বক্তা-শ্রোতা, লেখক-পাঠক, আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহণকারী উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে কোন সংজ্ঞাপন সাফল্য লাভ করে। এক্ষেত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি আমন্ত্রণকারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে সার্লের (Searle) মতে প্রতিক্রিয়া কৃতি বা সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হবে।[২৪] আমাদের সংস্কৃতিতে দেখা যায়, আমন্ত্রণগ্রহিতা সাধারণত আমন্ত্রণকারীর আদেশমূলক নিবেদন কৃতি বা অনুরোধে সাড়া প্রদান করে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বা অপারগতা প্রকাশ করে 'প্রতিক্রিয়া কৃতি' সম্পন্ন করার সাথে সাথে সফল সংজ্ঞাপনও সম্পন্ন করে থাকেন। উল্লিখিত দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য।

৫.৩ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

দাপ্তরিক শ্রেণির নমুনা দাওয়াতপত্রসমূহের উক্তিমালা বা ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী কিছু সংখ্যক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন আমন্ত্রিত অতিথির উদ্দেশ্যে, যেমন- 'সুধী', 'মাননীয়', 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন', 'সাদরে আমন্ত্রিত', 'আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি', 'গভীর শ্রদ্ধা', 'ধন্যবাদসহ' ইত্যাদি।

সারণি ৪: নিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি
১	সুধী	অনুমোদিত রীতি
২	মাননীয়	অনুমোদিত রীতি
৩	সানুগ্রহ সম্মান জ্ঞাপন	মিতচারিতা রীতি
৪	সদয় সম্মতি জ্ঞাপন	মিতচারিতা রীতি

৫	সাদরে আমন্ত্রিত	অনুমোদিত রীতি
৬	আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি	অনুমোদিত রীতি
৭	গভীর শ্রদ্ধা	অনুমোদিত রীতি
৮	ধন্যবাদসহ	সহানুভূতি রীতি
৯	মহান	অনুমোদিত রীতি

আমাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে অতিথিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর বিনম্রতা যেমন প্রকাশ পায়, আমন্ত্রণগ্রহিতাকেও তেমনি সম্মান জানানো হয়।

দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে 'সুধী' সম্বোধন করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সুধী' বিনম্রতাসূচক শব্দটি 'অনুমোদিত রীতি'। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দাপ্তরিক নমুনা দাওয়াপত্রে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথির উদ্দেশ্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পূর্বে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে রীতি অনুসারে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'মাননীয়' বিনম্রতাসূচক শব্দটিও 'অনুমোদিত রীতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশসমূহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথিকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন সেই বিষয়টিই 'সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন', 'সদয় সম্মতি জ্ঞাপন' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আমন্ত্রণকারী। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এ দুটি বাক্যাংশই 'মিতচারিতা রীতি'। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করেছেন অনুষ্ঠানের প্রধান/বিশেষ অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য। নমুনা দাওয়াতপত্রে 'গভীর শ্রদ্ধা','মহান' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ দুইটি আমন্ত্রণপত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান জানিয়ে। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এর মাধ্যমেও 'অনুমোদিত রীতি' প্রকাশ পেয়েছে। 'ধন্যবাদসহ' বিনম্রতাসূচক শব্দটি আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে উদ্দেশ্য করে দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। 'ধন্যবাদসহ' লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সহানুভূতি রীতি', এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. পর্যালোচনা

সামাজিক জীব হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি সমাজের মানুষকে বেশ কিছু সামাজিক রীতি-নীতি প্রথা পদ্ধতি, আচার-আচরণ মেনে চলতে হয়। প্রতিটি দেশের স্থানীয় অধিবাসী বা নাগরিক তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত।[২৫] এই রীতি-নীতি, প্রথা পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম বিষয় বিনম্রতা। বিনম্রতা জন্মসূত্রে অর্জিত কোনো গুণাবলি নয় বরং সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায়

প্রতিটি মানুষ বিনম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করে।[২৬] দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক এবং ভাষিক যোগাযোগ সুসম্পন্ন হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যখন বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তা এককভাবে করা হয় না। সবাইকে একত্রিত করে উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যবহার করা হয় দাওয়াতপত্র। এসব দাওয়াতপত্রে লিখিত ভাষিক রূপের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির নানামাত্রিক রূপ ফুটে ওঠে।

এই গবেষণাকর্মের ফলাফলে ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson)-এর বিনম্রতার তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষায় লিখিত দাপ্তরিক শ্রেণির দাওয়াতপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১৫টি কৌশলের মধ্যে বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রসমূহে ২টি কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে, যথা- i) শ্রোতাকে মনোযোগ, ii) শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা পক্ষান্তরে, নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১০টি কৌশলের মধ্যে ৫টি কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে। যথা- i) সম্মান দেওয়া ii) বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া iii) স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া iv) অকিঞ্চিৎকর হওয়া এবং v) হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা। কৌশলসমূহ অনুসারে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রে ৩৮টি ইতিবাচক এবং ৮৮টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়। শতকরা হিসেবে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে ৩০ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৭০ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন।

সংস্কৃতিগত ভাবেই বাঙালি সমাজে বিনম্রতার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেও এ প্রবণতা বিদ্যমান। অনুষ্ঠানে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো, তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য, আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা বিনীতভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আমন্ত্রণপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের 'অভিব্যক্তি' আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট উপস্থাপন করেন, একইসাথে দাওয়াতপত্রে তিনি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা 'অভীক' হ্রাস করেন। দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী এক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক ব্যবহার করেছেন ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের তুলনায়। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ আমন্ত্রিত অতিথির নিকট তুলে ধরার পাশাপাশি নেতিবাচক বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি পরিহার করার চেষ্টা করেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষায় ব্যবহার না করলে আমন্ত্রণগ্রহণকারী অসন্তুষ্ট হতেন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতেন না। ফলে, আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক হ্রাস পেতো। কার্যত, ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাওয়াতপত্রে এই ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ প্রয়োগের ফলে আমন্ত্রণগ্রহিতা নিজেও আমন্ত্রণকারীর

বিনম্রতা, আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধে সন্তুষ্ট হন। হাবউই (Habwe) এর মতে এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ বক্তার অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক হ্রাস করে সমাজে ঐক্যতান বজায় রাখে।[২৭]

লিচ (Leech) এর বিনম্রতার রীতি অনুসারে আমন্ত্রণকারী দাপ্তরিক শ্রেণির প্রতিটি দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, অভিলাষকে সীমিত করে, নিজেকে অকিঞ্চিৎকর করে আমন্ত্রণগ্রহিতার পছন্দকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করেন। আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা তথা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় দাপ্তরিক শ্রেণির দাওয়াতপত্রসমূহে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণকারী লিচের বিনম্রতার অনুমোদিত রীতি, মিতচারিতা রীতি এবং সহানুভূতি রীতি প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতির প্রয়োগ অধিক করেছেন আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। মিতচারিতা রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজেকে অকিঞ্চিৎকর করেন আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য। সহানুভূতি রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। আমন্ত্রণকারীর মূল উদ্দেশ্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সামাজিক রীতি অনুসারে তিনি বিনম্রতার ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্ব মতে ইতিবাচক বিনম্রতার সাথে লিচের বিনম্রতা রীতির সহানুভূতি রীতি এবং নেতিবাচক বিনম্রতার সাথে লিচের অনুমোদিত ও মিতচারিতা রীতির সাদৃশ্য রয়েছে। ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) বিনম্রতার তত্ত্ব এবং লিচের (Leech) বিনম্রতার রীতি উভয়ক্ষেত্রেই বিনম্রতার বিভিন্ন কৌশল বা রীতি ব্যবহার করা হয়েছে সামাজিক জীব হিসেবে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে মানব জীবনকে সহজ, গতিময় করার জন্য এবং একই সাথে ভাষিক যোগাযোগে সংঘাতময় পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য।

প্রতিটি দাওয়াতপত্র বিভিন্ন ধরনের কৃতি প্রকাশ করে। দাওয়াতপত্রের উক্তিমালায় প্রতিফলিত এসব কৃতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী তাঁর মনোগত অভিপ্রায় বা নিবেদন কৃতি প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকেন। সার্ল (Searle) এর বাককৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে বিশ্লেষিত দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রসমূহে প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে বিভিন্ন ধরনের নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন-বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি, আদেশমূলক নিবেদন কৃতি এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি। গৃহীত দাওয়াতপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুরোধের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন যা মূলত আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। এশিয়ান সংস্কৃতিতে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি সর্বাধিক গৃহীত কৌশল।[২৮] ব্রাউন ও লেভিনসনের (Brown and Levinson) তত্ত্বমতে আমন্ত্রণকারী আদেশমূলক নিবেদনকৃতি প্রকাশে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের

প্রয়োগ ঘটিয়েছেন দাওয়াতপত্রে। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমন্ত্রণগ্রহিতাকে প্রদান করেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে তিনি আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেন এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী তার বিনয়, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট তুলে ধরেন। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিনম্রতাসূচক শব্দ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেন। একই সাথে বাককৃতি অনুসারে লিচের বিনম্রতা রীতির প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে অনুমোদিত রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে লিচ (Leech) এর অনুমোদিত রীতি, প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতি ও সহানুভূতি রীতি আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন। এছাড়া অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতিতে মিতচারিতা রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

৭. উপসংহার

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ সুসম্পন্ন করি। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের সঠিক ব্যবহার পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা আন্তঃসামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বহন করে। সামাজিক যোগাযোগের অংশ হিসেবে দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাককৃতি প্রকাশে বিনম্রতাসূচক শব্দের/বাক্যাংশের প্রয়োগ করা হয় যার ফলে পারস্পরিক মিথক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, দাপ্তরিক দাওয়াতপত্রের বাককৃতি প্রকাশের জন্য বিনম্রতাসূচক শব্দের সঠিক প্রয়োগ সামাজিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়।

তথ্যসূত্র

১. G Leech, *The Pragmatics of Politeness*, Oxford University Press, New York, 2014
২. T Lin, The concept of "politeness": A comparative study in chinese and Japanese verbal communication, *Intercultural Communication Studies*, Vol. XXII, No. 2, 2013, pp. 151-165
৩. J. L. Austin, *How to do things with Words*, Oxford University Press, Oxford, 1962
৪. E Walter, (eds), *Cambridge Dictionary*, Cambridge University Press, 2005, pp. 535
৫. G Breslin (eds), *Collins English Dictionary*, Collins UK, 2014, pp. 455
৬. Y Huang, Politeness Principle in Cross Cultural Communication, *English Language Teaching*, Vol. 1, No.1, 2008, pp. 96-101
৭. হাকিম আরিফ, *সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান*, যন্ত্রস্থ, ২০২৩

৮. P Brown and S Levinson, *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987
৯. Y Gu, Politeness phenomena in modern chinese, *Journal of Pragmatics*, Vol. 3, 1990, pp. 237-257
১০. হাকিম আরিফ, *সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান*, যন্ত্রস্থ, ২০২৩
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. G Leech, *Principles of Pragmatics*, Longman, London, 1983
১৪. H Arif, Bengali everyday emblematic (BEF) hand gestures: A Pragmatic approach, *Berlin Technical University*, Berlin, An unpublished PhD Thesis, 2011
১৫. J.L. Austin, *How to do things with Words*, Oxford University Press, Oxford, 1962
১৬. R Searle, *Speech Acts*: *An Essay in the philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. H Arif, Bengali everyday emblematic (BEF) hand gestures: A Pragmatic approach, *Berlin Technical University*, Berlin, An unpublished PhD Thesis, 2011
১৯. R Searle, *Speech Acts*: *An Essay in the philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969
২০. প্রাগুক্ত
২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. N Al-Khawaldeh and Zegarac, Cross-Cultural Variation of Politeness Orientation & Speech Act perception, *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, Vol. 2, No. 3, 2013, pp. 231-239
২৬. M Shahrokhi and S.F Bidabadi, An Overview if Politeness Theories: Current Status, Future Orientations, *American Journal of Linguistics*, Vol. 2, 2013, pp. 17-27
২৭. J. H. Habwe, Politeness Phenomena: A case of Kiswahili Honorifics, *SWAHILI FORUM* 17, 2010, pp. 126-142
২৮. M Harooni, Politeness and Indirect Request Speech Acts: Gender Oriented Listening Comprehension in Asian EFL Context, *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, Vol. 6, No. 2, 2017, pp. 214-220

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

মধ্যমব্যায়োগ নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিকাভিনয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ

কাজী তামান্না হক সিগমা*

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃত সাহিত্যে এক অনন্য গ্রন্থ ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। নাটকের ব্যাকরণ ও প্রকরণ সম্পর্কিত এই গ্রন্থে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য – এই চার প্রকার অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। ভাস রচিত *মধ্যমব্যায়োগ* নাট্য প্রযোজনাটি ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্য বৈশিষ্ট্যকে অনেকাংশেই মান্য করেছে। উক্ত প্রযোজনায় নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আঙ্গিকাভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যের নান্দনিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। নাট্যশাস্ত্রের সংকেতাবদ্ধ অভিনয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত আঙ্গিকাভিনয়ের বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং সেই সাথে দেশজ বা লোক নৃত্যের আঙ্গিকের মিশ্র প্রয়োগ এই নাট্যপ্রযোজনার একটি পরীক্ষামূলক স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে *মধ্যমব্যায়োগ* নাট্যপ্রযোজনায় শাস্ত্রীয় নৃত্য আঙ্গিক কিংবা দেশজ নৃত্য আঙ্গিকের অনুষঙ্গ কোন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দঃ ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, প্রযোজনা, আঙ্গিক, নিরীক্ষণ।

নাট্যশাস্ত্র ও মধ্যমব্যায়োগ

ভাস রচিত *মহাভারত* ভিত্তিক ৬টি নাটকের মধ্যে একটি *মধ্যমব্যায়োগ*। *মহাভারতের* কিছু চরিত্র এই নাটকে উপস্থিত থাকলেও বিষয়ের দিক থেকে এই নাটকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে একেবারেই সম্পৃক্ততা নেই। *মধ্যমব্যায়োগ* নাটক মূলত ভাসের কল্পনা প্রসূত।

> ভাসের অন্যান্য মহাভারত-ভিত্তিক নাটক থেকে এই ক্ষুদ্র নাটকটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এটিতে ভাস নাটক রচনায় একটি নতুন পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি চরিত্র তিনটিকে শুধু বহাল রেখেছেন: ভীম, তার রাক্ষস পত্নী হিড়িম্বা ও তাদের পুত্র ঘটোৎকচ; কিন্ত পাণ্ডবদের অরণ্য-জীবনের শুধুমাত্র একটি ধারণা দেওয়া ছাড়া কার্যত মূল কাহিনীর কিছুই রাখেননি।[১]

নাটকের স্বরূপ আলোচনায় ধনঞ্জয় তাঁর রচিত গ্রন্থ *দশরূপক*-এ বলেছেন "অবস্থানুকৃতির্নাট্যম অর্থাৎ, অবস্থার অনুকরণই হচ্ছে নাটক।"[২] এই নাটক দৃশ্যত হয় বলে একে 'রূপ' ও বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়– 'দৃশ্য' এবং 'কাব্য'। আবার 'দৃশ্যকাব্য' রূপক নামেও অভিহিত হয়। "ভারতীয় দৃশ্য-কাব্যের দশরূপ। এই দশরূপেরই সাধারণ নাম 'রূপক'।"[৩] এ প্রসঙ্গে মনোমোহন ঘোষ তার Nandikesvra's Abhinayadarpanam A manual of festure and posture used in hindu dance and drama গ্রন্থে বলেন, "A play is called rupa or rupaka, having-a-form' on account of its visibility (drsyata)"[৪]

নাট্যশাস্ত্রে 'দশরূপবিধান' অধ্যায়ে রূপকের দশটি প্রকারভেদ এবং এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। দশ প্রকার রূপক হলো, "নাটক, প্রকরণ, অংক (উতসৃষ্টিকাংক), ব্যয়োগ,

* সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম, ইহামৃগ – এই দশটি (রূপক) নাট্যলক্ষণে জ্ঞেয়।"[৫] দশরূপকের একটি রূপক হলো 'ব্যায়োগ'। এই ব্যায়োগের বৈশিষ্ট্য হলো– নায়ক হবে প্রখ্যাত, স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা থাকবে অল্প, ঘটনা হবে একদিনে নিস্পাদ্য, একাংক হবে, দিব্য নায়ক এতে থাকবে না। "নিয়মমাফিক ব্যায়োগের মধ্যে থাকবে একজন উদ্ধত নায়ক, যুদ্ধাদি সমন্বিত একটি সতেজ বিষয়বস্তু ও উত্তেজনাময় ভাব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে।"[৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ) থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'মার্গনাট্য অভিনয়' উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগ ২০০৪ ও ২০১০ সালে দুবার মহাকবি ভাস রচিত *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকটি প্রযোজনা করে। প্রযোজনা দুটির নির্দেশক ছিলেন ওয়াহিদা মল্লিক। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চায় প্রযোজিত ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্য প্রযোজনার মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজিত *মধ্যমব্যায়োগ* (২০০৪) প্রযোজনাটিই প্রথম, যেখানে ভরত নাট্যশাস্ত্রের সংকেতাবদ্ধ অভিনয়ের বিধিবিধান মান্য করে নির্মিত হয়েছে। পরবর্তীতে *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকটি ২০১০ সালে একই নির্দেশক পুনরায় নির্দেশনা দেন, যা ছিল ২০০৪ সালের উপস্থাপনার আঙ্গিক থেকে ভিন্ন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ২০১০ সালের প্রযোজনার আলোকে *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকের আঙ্গিকাভিনয়ের প্রয়োগের রূপ, বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করা হবে সেই সাথে নাট্যশাস্ত্রের সংকেতাবদ্ধ অভিনয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত আঙ্গিকাভিনয়ের বিধিবদ্ধ নিয়ম উক্ত প্রযোজনায় কতটা মান্য করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা।

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের এই প্রযোজনার উদ্দেশ্য– ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যের অভিনয় ধারার চর্চা, বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা করা। তাই প্রযোজনাটির আঙ্গিকাভিনয়ের স্বরূপ উৎঘাটনে ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিকাভিনয়ের ধরন, বৈশিষ্ট্য, রূপ, নিয়ম-নীতিকে আলোচনায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই ধারাবাহিকতায় নাট্যশাস্ত্রের আঙ্গিকাভিনয়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ, ধরন ও রূপ-কে উপস্থাপন করা হলো।

নাট্যশাস্ত্র অনুসৃত আঙ্গিকাভিনয়

ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যের স্বরূপ 'অবস্থানুকৃতি', এই অবস্থার অনুকৃতি বা অনুকরণ চার ভাবে হয়, যথা: অঙ্গভঙ্গী, বাক্য, বেশভুষা ও রোমাঞ্চ স্বেদোদম প্রভৃতি দ্বারা – যা নাট্যশাস্ত্রে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক নামে অভিহিত।

> আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্য : সাত্ত্বিকস্তথা।
> জ্ঞেয়স্ত্বভিনয়ো বিপ্রাশ্চতুর্ধা পরিকল্পিতঃ।। (৮/৯)[৭]

নাট্যশাস্ত্র ভিত্তিক ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের চতুর্বিধ অভিনয় প্রকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম আঙ্গিকাভিনয়। নাট্যকলা ও নৃত্যকলার উভয় ক্ষেত্রেই আঙ্গিক, মনের ভাব প্রকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নৃত্যকলায় আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমেই রস নিস্পত্তি ঘটে ও নাট্যকলায় বাচিকাভিনয় অথবা কথা বা সংলাপ মুখ্য হলেও আঙ্গিকের গুরুত্ব বা ভূমিকা গৌণ নয়।

অভিনেতার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশের ছোট ছোট সকল উপাঙ্গই আঙ্গিকাভিনয়ের আওতায় পড়ে। বলা যায় একজন মানুষের শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গেরই বিধিবদ্ধ ব্যবহার নিয়ে সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম আলোচনা উল্লেখ রয়েছে ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে*। *নাট্যশাস্ত্রের* অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখিত আঙ্গিকাভিনয়ের প্রকারভেদ লক্ষ করলেই তা স্পষ্ট হয়, "আঙ্গিক অভিনয় তিন প্রকার দেখা যায়, যথা: শারীর, মুখজ এবং শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সংযুক্ত চেষ্টাকৃত।"[৮]

শারীর, মুখজ এবং শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গের চলনের বা ক্রিয়ার মাধ্যমে আঙ্গিকাভিনয় সংঘটিত হয়। নৃত্যের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যমই যেহেতু আঙ্গিকের ব্যবহার তাই প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ড. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মত এখানে প্রাসঙ্গিক, "অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর চলনের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে।"[৯] বচন ছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু, অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং অনুধাবন অনেক সময়ই সম্ভব হলেও আঙ্গিক ছাড়া সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ দুর্বোধ্য। ভিন্ন অঞ্চল বা ভিন্ন ভাষার একজন দর্শক, অভিনেতার ভাষা দ্বারা যখন যোগাযোগ তৈরিতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে সহজেই ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগ তৈরি সহজ হয়ে যায়। ভিন্ন অঞ্চল, দেশ, ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন হলেও আঙ্গিকের এমন শক্তি রয়েছে যা দ্বারা বিশ্বের যেকোন প্রান্তে গিয়েও সহজেই যোগাযোগ সম্ভব হয় এবং এ বিষয়টি নাট্যশাস্ত্রের আলোকে আরো সত্যরূপ লাভ করে।

শারীর: শরীরাভিনয় আলোচনায় ৭টি অঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। বক্ষ, পার্শ্ব, উদর, কটি, ঊরূ, জংঘা ও পদ। এই সাত প্রকার অঙ্গের নানাবিধ প্রকারভেদ রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি অঙ্গের বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভঙ্গি ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্ভব। অঙ্গের বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের মাধ্যমে পুরো শরীরের বিভিন্ন অংশের বহুমাত্রিক ব্যবহারের দক্ষতা অভিনেতা অর্জন করে।

নাট্যশাস্ত্র মতে, **বক্ষ** পাঁচ প্রকার– আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত, উদ্বাহিত ও সম। **পার্শ্ব** নত, সমুন্নত, প্রসারিত, বিবর্তিত ও অপসৃত। **উদর** তিন প্রকার– ক্ষাম, খল্ব ও পূর্ণ। **কটি** পাঁচ প্রকার– ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, প্রকম্পিতা ও উদ্বাহিতা। **ঊরূ** পাঁচ প্রকার– কম্পন, বলন, স্তম্ভন, উদ্বর্তন, নিবর্তন। **জংঘা** পাঁচ প্রকার– আবর্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত ও পরিবৃত্ত। **পদ** পাঁচ প্রকার– উদঘট্টিত, সম, অগ্রতলসঞ্চর, অঞ্চিত, কুঞ্চিত। উপরে উল্লেখ্য প্রতিটি অঙ্গের প্রকারভেদ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার বা প্রয়োগ বিধি নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।

মুখজ এবং শাখা: মুখজ এবং শাখার সাথে অঙ্গ ও উপাঙ্গ যুক্ত। কেননা "অঙ্গভঙ্গীর নাম শাখা।"[১০] অঙ্গের মধ্যে রয়েছে– মস্তক, হস্ত, কটি, বক্ষ, পার্শ্ব ও পদ। উপাঙ্গগুলো হলো– নেত্র, ভ্রু, নাসিকা, অধর, গণ্ডস্থল ও চিবুক। অভিনয়ের বিষয় অনুযায়ী চার প্রকারের মুখরাগ এর উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন রস অনুযায়ী বা ভাব ও রসের ভিন্নতায় মুখরাগ পরিবর্তন বা ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম– এই চার প্রকার মুখরাগ অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মুখজ ক্রিয়া: মুখরাগের পাশাপাশি ৬ প্রকার মুখজ ক্রিয়া রয়েছে।

বিধুতং বিনিবৃত্তং চ নির্ভুগ্নং ভুগ্নমেব চ।।
বিবৃত্তং চ তথোদ্বাহি কর্মাণ্যত্রাস্যজানি তু। [৮/১৪৯ (খ)-১৫৬ (ক)][১১]

বিধুত, বিনিবৃত্ত, নির্ভুগ্ন, ভুগ্ন, নিবৃত্ত, উদ্বাহি এই ছয় প্রকার মুখজ ক্রিয়ার সাথে দৃষ্টি যুক্ত হয়ে মুখজ ক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়।

অঙ্গ: শারীরাভিনয় অধ্যায়ে যে ৭টি অঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সেখানে 'মস্তক' ও 'হস্ত'-কে নাট্যশাস্ত্রের এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আঙ্গিকাভিনয়ের তিন প্রকার অঙ্গের প্রকারভেদে 'মস্তক' ও' হস্ত' সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। "অঙ্গ ছয়টি– মস্তক, হস্ত, বক্ষ, পার্শ্ব, কটি, পাদ।"[১২]

মস্তক ক্রিয়া: নাট্যশাস্ত্রে ১৩ প্রকার মস্তক ক্রিয়া রয়েছে, "আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও ললিত।"[১৩] উপদেশ, জিজ্ঞাসা, নির্দ্দেশ, ক্রোধ, বিশেষভাবে বোঝা, বিষাদ, বিস্ময়, পার্শ্বে দৃষ্টিপাত, ত্র্যাসগ্রস্ত, ভীত, গর্ব, ইচ্ছা প্রকাশ, উপরের দিকে তাকানো, রোগার্ত, মূর্ছিত, স্তম্ভ, অভিমান ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার প্রকাশে তেরো প্রকারের মস্তক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়।

হস্তাভিনয়: এক ও দুই হাতের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত এই দুই প্রকারে বিভক্ত করে ২৪টি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা ও ১৩ টি সংযুক্ত হস্তমুদ্রার বিবরণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও নানাবিধ নৃত্তহস্তের প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

উপাঙ্গ: ছয় প্রকার উপাঙ্গের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে নেত্র (নয়ন বা চোখ) নিয়ে। ভাব ও রসের বিচিত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশে চোখ অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। চোখের মাধ্যমেই দৃষ্টি তৈরি হয়। চোখের ব্যবহারের কত বৈচিত্র্য রয়েছে তা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত দৃষ্টির নানাবিধ প্রকার, প্রয়োগ ও আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়।

> First, from the point of view of the look of the eyes, the author mentions thirty-six varieties. Of these, eight convey eight rasa-s, the next eight express the eight Sthayi bhava-s and the remaining twenty, the other bhava-s.[১৪]

দৃষ্টির ৩৬টি প্রকারভেদ উল্লেখের পাশাপাশি আরো ৮ প্রকারের দৃষ্টিভেদও বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টির সাথে যেহেতু অক্ষিপুট ও তারা (চোখের মণি) যুক্ত তাই এই দুটি বিষয়েরই ৯টি করে প্রকারভেদ ও প্রয়োগ বিধির উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মুখের গঠনের মধ্যে চোখের গুরুত্ব এমন যে, চোখই মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। চোখের চাহনি দ্বারাই নানাবিধ ভাব ও রসের প্রকাশ সম্ভব। ৩৬ প্রকারের দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতার মনের ভাব প্রকাশিত হয় সেই সাথে যেহেতু চোখের সীমানার সঙ্গে ভ্রূ-র অবস্থান যুক্ত বিধায় চোখের সাথে ভ্রূ-র ক্রিয়া একত্রিত হয়েই বিভিন্ন রকম দৃষ্টি তৈরি করে। নাট্যশাস্ত্রে ৭ প্রকার ভ্রূ ক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও নাসিকা, গণ্ডস্থল ও অধর (ওষ্ঠ) এই ৩টি উপাঙ্গের প্রতিটিরই ৬টি প্রকারভেদের আলোচনা রয়েছে, এবং গ্রীবার ক্রিয়া রয়েছে ৯ প্রকার।

চারী বিধান: এছাড়াও চারী বিধান অধ্যায় যেখানে কোমর বা কটি, ঊরু জংঘা ও পায়ের পাতার যুগ্ন চলনকে ব্যাখ্যা করেছেন ভৌমি চারী ও আকাশিকী চারীর বর্ণনার মাধ্যমে। এই দুই প্রকার চারীতে ১৬টি করে মোট ৩২টি চারীর প্রয়োগ ও ব্যবহার বিধির আলোচনা রয়েছে।

মণ্ডল বিধান: চারী সহযোগে করণীয় মণ্ডল বিধান নিয়ে বর্ণিত রয়েছে মণ্ডল বিধান অধ্যায়ে। আকাশিক মণ্ডলে ১০ প্রকার মণ্ডল ও ভৌম মণ্ডলে ১০ প্রকার মণ্ডল বিধানের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে এই দুই প্রকার মণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত মোট ২০ ধরনের লক্ষণ ও প্রয়োগ নিয়ে ভরত ব্যাখ্যা করেছেন।

গতি প্রচার: মঞ্চে পাত্র পাত্রীগণের (অভিনেতা) প্রবেশ, পাত্রের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রবেশের পর তাদের শারীর বিন্যাস, চরনদ্বয়ের মাঝের দূরত্ব, পদক্ষেপের স্থাপনের নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা, চরিত্রের ভূমিকা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লয়ের গতি, অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন স্থানের গতি, নানাবিধ চরিত্রের নানাবিধ গতি, দিব্য-অদিব্য পশু পক্ষীসহ নানা জাতির গতি প্রচার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে নাট্যশাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে।

নিরীক্ষণ পদ্ধতি

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে *মধ্যমব্যায়োগ* প্রযোজনায় স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণে গুণগতমান বিশ্লেষণ (qualitative method) প্রদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী ৩ জন অভিনেতা ফাহমিদা তানজী, ক্যাথরিন পিউরিফিকেশন ও ইরা আহমেদ, নির্দেশক ওয়াহীদা মল্লিক এবং দেহশৈলী ও আঙ্গিক প্রশিক্ষক ওয়ার্দা রিহাবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আঙ্গিকাভিনয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণে 'নাট্যশাস্ত্র', মধ্যমব্যায়োগ নাটলিপি ও প্রকাশিত বা মুদ্রিত নাট্য সমালোচনা বা রিভিউসমূহকে দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও আঙ্গিকাভিনয়ের (হস্তমুদ্রা, চলন শৈলী, ভঙ্গি, অভিব্যক্তি প্রভৃতি) বিশ্লেষণে ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স হিসেবে আলোচকচিত্র ও স্ক্রেচ উপস্থাপন করা হলো।

মধ্যমব্যায়োগ নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিকাভিনয় বিশ্লেষণ

নান্দী

মধ্যমব্যায়োগ নাট্য প্রযোজনার শুরুতেই 'নান্দী' উপস্থাপিত হয়। যেখানে নাটকের সকল অভিনেতা বা কলাকুশলী অংশগ্রহণ করে। পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গের একটি অঙ্গ হলো নান্দী। নাটকের মূল ঘটনায় প্রবেশের পূর্বে এই অংশটি পরিবেশিত হয়। "নাট্যবস্তু প্রয়োগের পূর্বে রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্য নটনটী, কুশীলবগণ যে অনুষ্ঠানটি করেন তাই পূর্বরঙ্গ।"[১৫] পূর্বরঙ্গের আনুষ্ঠানিকতার দুইটি পর্যায় থাকে। যবনিকার অন্তরালে করণীয় বা পালনীয় ৯টি অঙ্গ এবং যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য ১০টি অঙ্গ, যার একটি হলো নান্দী। সকল শুভ কর্মের জয়, মঙ্গল কামনা, দেবতাকে নমস্কার, তার তুষ্টি লাভ, কাব্যকারের সম্মৃদ্ধি, উন্নতি, যশলাভ, ধর্মবৃদ্ধি কামনা – এ সবই নান্দী পাঠের মাধ্যমে করতে হয়।

চিত্র : নান্দী অংশে আকম্পিত মস্তকক্রিয়ার ও সূচীমুখ মুদ্রার প্রয়োগ লক্ষণীয়

চিত্র : সুচীমুখ মুদ্রা

নান্দী পাঠের এই অংশের পরিবেশনায় নৃত্য, গীত ও বাদ্য যুক্ত হতে পারে। কেননা পূর্বরঙ্গ প্রসংঙ্গে ড. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "এককথায় পূর্বরঙ্গ দর্শকবৃন্দেরও রঞ্জনের পূর্বকৃত্যের আয়োজন। এই পর্যায়ে অভিনয় আরম্ভের আগে গীত, তাল, নৃত্য পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ তাই হচ্ছে পূর্বরঙ্গ।"[১৬] পূর্বরঙ্গের অংশ হিসেবে নান্দীতেও এ বিষয়গুলো যুক্ত হওয়া যৌক্তিক। সেই আলোকে *মধ্যমব্যায়োগ* নাট্য প্রযোজনার নান্দী অংশকে বর্ণনা করলে বলা যায়– নান্দীর পুরো অংশই অভিনেতারা গীতের সুর ও ছন্দের সাথে সাথে নৃত্যময় ভঙ্গীমায় সম্পন্ন করে। অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য সহযোগে নান্দী পাঠ করা হয়। শারীরাভিনয়, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, এবং উপাঙ্গের সহযোগে আঙ্গিকের ব্যবহার ছিল নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত নানাবিধ ভেদ ও প্রয়োগবিধির নিয়মানুযায়ী। সেই সাথে মণিপুরী নৃত্যের নানাবিধ চালি, ভঙ্গি, তাল ও লয়াশ্রয় বোলবানী সংযুক্ত অঙ্গভঙ্গির প্রয়োগও নান্দীতে লক্ষণীয়। মণিপুরী নৃত্য সংগঠনে প্রাচীন ও প্রধান অঙ্গ হলো 'চালি'। "নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চারি নৃত্যপদ্ধতিই মৈতৈ ভাষায় মণিপুরে চালিরূপে প্রচলিত। [...] মণিপুরী নৃত্যগুরুরা এই নৃত্য পরিকল্পনায় চালিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ মনে করেন। নৃত্যকল্পনাটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে মূর্ত করে তোলার কাজে চালির মাধ্যমে বিভিন্ন জ্যমেতিক নকশা রচনা করা হয়।"[১৭] অর্থাৎ মণিপুরী নৃত্যে চালি ও চালির মাধ্যমে কৃত চলন দ্বারা তৈরি নানাবিধ নকশা এই নৃত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। *মধ্যমব্যায়োগ* নাট্য প্রযোজনার নান্দীর আঙ্গিকাভিনয়ে মণিপুরী নৃত্যের বেশ কিছু চালির লাস্যময় প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সূত্রধর

নান্দীশেষে সূত্রধরের প্রবেশ হয়। সূত্রধরের আঙ্গিকাভিনয় দ্বারা তার বর্ণনার প্রতিটি শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও দৃশ্যায়ন তৈরি করে। এই পর্ব মূলত বর্ণনা নির্ভর। সূত্রধরের সংলাপ, "তিন

ভুবনের পরিমাপের সময় আকাশ সমুদ্রে বৈদ্যুর্যমণিমণ্ডিত সেতুর মতো চরণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।"[১৮] সূত্রধর চরিত্রে পরিবেশনাকারী ইরা আহমেদ বলেন:

> সুত্রধরের এই সংলাপের 'তিন ভূবন পরিমাপের সময়' এই অংশটুকুর আঙ্গিকাভিনয়ের জন্য অভিনেতা আরামাণ্ডি ভঙ্গী বা (Half sitting) এ থেকে অসংযুক্ত হস্তে তিন ভূবন কে নির্দ্দেশ করার জন্য, একটি হাতে 'ত্রিশুল' মুদ্রার ব্যবহার ও অন্য হাতকে কোমরে স্থাপন করে। এছাড়াও দুইপায়ের মাঝে সাড়ে তিন তাল দূরত্ব রেখে পা-কে এমন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে চারী বিধানের ৬ ধরনের স্থানের মধ্যে 'বৈশাখ' স্থানকে নির্দেশ করে। মস্তক ক্রিয়ার 'উদ্বাহিত' মস্তক ব্যবহার করা হয়। 'আকাশ সমুদ্রে' এই শব্দ উচ্চারণের সময় আঙ্গিকের যে রূপ ব্যবহৃত হয়েছে যা পদ এর ক্ষেত্রে ছিল 'সমপাদ' পদ। হাতের প্রয়েগের ক্ষেত্রে, দুইটি হাতকে সমান্তরালভাবে সোজা উপরের দিকে তুলে দিয়ে অপর দুইটি হাতকে উপর থেকে মাথার দুপাশ থেকে নামিয়ে দুইবাহু বরাবর স্থাপন করে ক্রমান্বয়ে দুইটি হাত কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত এমন ভাবে দোলানো হয়েছে, যা সমুদ্রের ঢেউকে নির্দ্দেশ করে। সেই সাথে মস্তককে প্রথমে 'উৎক্ষিপ্ত' মস্তকক্রিয়া করে তারপর 'পরাবৃত্ত' মস্তক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯]

দৃষ্টির ক্ষেত্রে 'বীরা', 'দীপ্তা' এবং 'প্রলোকিত' ব্যবহৃত হয়েছে। 'বৈদুর্যমণ্ডিত সেতুর মতো চরণ'-উক্ত সংলাপে অভিনেতা, বাম পায়ের সামনের হাটুকে বক্র ভাবে ভেঙ্গে, ডান পা-কে পেছনের দিকে টান টান রেখে কৌণিক ভাবে ব্যবহার করেছে। দুইটি হাতে 'পতাকা' হস্ত ধারণ করে বামদিকে উর্দ্ধ থেকে কৌণিকভাবে ডানদিকে নিচের দিকে নামানো হয়।

চিত্র : ত্রিশুল মুদ্রা

চিত্র : পতাক মুদ্রা

হাতের গতির সাথে মস্তক ও দৃষ্টি অনুসরণ করা হয়। বাক্যের এই অংশ 'উজ্জল হয়ে উঠেছিল'-এর আঙ্গিকাভিনয়ের ক্ষেত্রে মস্তক ক্রিয়ার 'উদ্বাহিত' মস্তক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এতে রসদৃষ্টি ছিল 'অদ্ভুত', 'প্রসারিতা'। দৃষ্টিভেদ ছিল 'আলোকিত' ও 'উল্লেকিত' ভ্রু-ক্রিয়া ছিল 'উৎক্ষেপ'। নাসিকার ব্যবহার হয়ে উঠে 'উৎফুল্ল'। সূত্রধারের একটি বাক্যের তিনটি অংশকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় প্রতিটি অংশেই আঙ্গিকাভিনয়ের মস্তক, হস্ত, কটি, পদ, চারীসহ মুখমণ্ডলের উপাঙ্গেরও ব্যবহার হয়েছে যা নাট্যশাস্ত্রের বর্ণিত প্রয়োগ বিধি অনুসরণে নির্মিত হয়েছে।

ঘটোৎকচ

মধ্যমব্যায়োগ নাট্যপ্রযোজনার শুরুর দৃশ্যেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্ররা ভীষণ আতঙ্ক, ভয় ও শংকা নিয়ে বনের মধ্য থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাদের হাটার গতি ছিল দ্রুত লয়ের। সেই সাথে মঞ্চে ঘটোৎকচ এর উপস্থিত না থাকলেও তার হুঙ্কার ভেসে আসছিল মঞ্চের বাহির থেকে। আওয়াজ যত বেশি বাড়ছিল ব্রাহ্মণ পরিবারের হাটার গতিও তত বাড়ছিল। ব্রাহ্মণ পরিবারের পালিয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে ভীষণ আওয়াজ সহকারে মনিপুরী নৃত্যের বিশেষ চলন 'লংহুল'-এর মাধ্যমে এক প্রকার বৃত্তাকারে ঘুর্ণন এর সহযোগে ঘটোৎকচ মঞ্চে প্রবেশ করে। এ সম্পর্কে উক্ত নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিকাভিনয় প্রশিক্ষক ওয়ার্দা রিহাব বলেন, "মণিপুরী নৃত্যের (acrobetic) মল্লক্রিয়া বা দড়াবাজি চলনের এক প্রকার চলনের নাম 'লংহুল'। যা ঘূর্ণনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। 'লংহুল' মণিপুরী নৃত্যের 'পুঙচোলম'-এ বহুল ব্যবহৃত একটি চলন।"[২০]

ঘটোৎকচ ঘূর্ণন শেষে যখন স্থির হয়ে দড়ায় তখন দু'পায়ের হাঁটু ভাঁজ বা বেন্ট করে, দুই হাতে অলপদ্ম মুদ্রাকেই অনেকটা 'ব্যাঘ্র' এর মতো করে সামনের দিকে প্রসারিত করে। এই মুদ্রাকে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত নৃত্যহস্তের 'অলপল্লব' মুদ্রার সাদৃশ বলা যায়।

চিত্র : অলপদ্ম মুদ্রা

ভরত নাট্যশাস্ত্রে হস্তাভিনয় অধ্যায়ে হস্তমুদ্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ বিধিতে বলা হয়েছে, "আকৃতি, গতি চিহ্ন ও জাতি দ্বারা জেনে নিজে অনুমান করে পণ্ডিতগণ কর্তৃক হস্তাভিনয় করণীয়।"[২১] এছাড়াও প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় নৃত্যকলা' গ্রন্থে নৃত্যহস্তের পাঁচরকমের গতির প্রসঙ্গে বলেন, "ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি, উত্তরা গতি, প্রাচীগতি ও দক্ষিণাগতি। পদবিক্ষেপ অনুযায়ী এই গতি সঞ্চালিত হয়।"[২২] এই প্রসঙ্গে নাটকের নির্দেশক ওয়াহীদা মল্লিক বলেন, "পুরো নাটকেই ঘটোৎকচ চরিত্রে 'অলপল্লব' মুদ্রা নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও পদবিক্ষেপ অনুযায়ী বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩] নিচের তিনটি চিত্রে তারই ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়।

চিত্র : দুই হাটু বেন্ট করে আড়ামাণ্ডি অবস্থায় দুই পদের মাঝে চার হতে পাঁচ তাল দূরুত্বে অবস্থান ও অলপল্লব হস্তের বিভিন্ন রকম ব্যবহার

"অলপল্লব হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ উদ্বেষ্টিত (শিথিল) করে হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে প্রসারিত ও আবিদ্ধ হলে উল্বণ নামে জ্ঞেয়।"[২৪] চিত্রে ঘটোৎকচ চরিত্রের হাতের মুদ্রায় এর প্রযোগ লক্ষণীয়। নাট্য ও নৃত্যের নানাবিধ ব্যবহারের প্রাধান্য অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন মুদ্রার সংকর (মিশ্রণ) করে নতুন নামকরণও হয়।

সঙ্করোহপি ভবেত্তেষাং প্রয়োগেহর্থবশাৎ পুনঃ।
প্রাধান্যেন পুনঃ সংজ্ঞা নাট্যে নৃত্তে করেস্বিহ।। (৯/১৯৯)[২৫]

চিত্র : অলপল্লব হস্তের ব্যবহার

ঘটোৎকচ চরিত্রের অভিনেতার প্রতিটি চলন পদক্ষেপের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হলো দুই পদের মাঝে অন্তত চার থেকে পাঁচ তাল দূরত্ব সর্বদা বিরাজমান এবং দুই হাঁটু (Bent) বা ভাঁজ বা বক্র করে অনেকটাই আরামাণ্ডি অবস্থানে থাকা। ঘটোৎকচ যেহেতু রাক্ষস পুত্র তাই স্বাভাবিক মানুস্য চরিত্রের স্বাভাবিক চলনের থেকে ঘটোৎকচ চরিত্রের চলনে ভিন্নতা আসে (Half sitting) বা আরামাণ্ডি অবস্থানে থেকে বড় বড় পদক্ষেপের ব্যবহরের ফলে।

চিত্র : ঘটোৎকচ চরিত্রের আরামাণ্ডি অবস্থান ও ব্রাহ্মণী চরিত্রের অঞ্জলি মুদ্রার ব্যবহার

চিত্র : অঞ্জলি

কখনও কখনও এই পদক্ষেপকে আগ্রতলসঞ্চর হয়েও ব্যবহার হতে দেখা যায়। পাঁচ প্রকার পাদভেদ এর একটি হলো অগ্রতলসঞ্চর। "গোড়ালি ঊর্ধ্বে উত্থিত করে পদাগ্র ভূমিতে স্থাপনা করলে অগ্রতলসঞ্চার হবে।"[২৬] এটা মূলত 'টো' (Toe) নিভর হাঁটা বা চলন। "বক্র হাঁটুতে টো নির্ভর অবস্থান ব্যক্তির শরীরে খোলা, উন্মুক্ত, নমনীয়, হালকা অথবা অভিমুখীন হওয়ার ধারণা বা উপলব্ধিকে সহজ করে তোলে অর্থাৎ শরীরের বহুমুখি গতিশীলতার উপলব্ধি এবং শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে।"[২৭] ঘটোৎকচ চরিত্রের চঞ্চলতা, অস্থিরতা প্রকাশে বহুমুখী গতিশীলতার চলন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছড়াও ঘটোৎকচ যেহেতু রাক্ষস পুত্র এবং বনের মধ্যে তার বসবাস সেহেতু তার চলাচল, স্বভাব, আচরণ বৈশিষ্ট্য বনের নানাবিধ পশুপাখির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই ঘটোৎকচ ক্ষেত্রে বক্র হাটুর অগ্রতলসঞ্চর বা টো নির্ভর চলন খুবই যৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে তাদাসি সুজুকির এই বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসংঙ্গিক:

> Animals that walk on their toes, such as dogs, cats and other carnivorous species, do not touch their heels to the ground. They are able to walk comparatively quickly. Hooved animals such as deer, goats, and horses also stand on their toes, which constitute the hoof, and so are able to move quite swiftly.[২৮]

এছাড়াও ঘটোৎকচকে মাঝে মাঝে 'সৌষ্ঠবাঙ্গ' অবস্থানে স্থির থাকতে দেখা যায়। গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর আঙ্গিকাভিনয় গ্রন্থে 'সৌষ্ঠবাঙ্গ' প্রসঙ্গে বলেন "যাতে কটিদেশ, কর্ণ কূর্পর, স্কন্ধ ও মস্তক স্বাভাবিক ভাবে থাকে এবং বক্ষ উন্নত হয় তাকে সৌষ্ঠবাঙ্গ বলে।"[২৯] অর্থাৎ বক্ষকে উন্নত অবস্থায় রেখে মস্তক (মাথা), কর্ণ (কান), স্কন্ধ (কাঁধ), কূর্পর (হাতের কনুই) ও কটিদেশ (কোমর) একটি রেখায় সমানভাবে অবস্থান করবে। ঘটোৎকচ চরিত্রে আরও একটি বিশেষ চলন ব্যবহার হয়েছে যাকে (Jump) বা লম্ফ বলা যায়। একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের সময় বড় বড় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে একটি লম্ফের মাধ্যমে অবস্থান নিতে দেখা যায়। সেই সাথে লক্ষণীয় দুইটি হাত প্রসারিত করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালন। এই চরিত্রের দৃষ্টির ব্যবহার ছিল প্রধানত কুটিল ভ্রূকুটিযুক্ত ক্রুদ্ধাদৃষ্টি। অবস্থাভেদে কখনও কখনও 'শংকিতা', 'বিকোশা', 'উল্লোকিত' ও 'প্রলোকিত' দৃষ্টির

ব্যবহার দেখা যায়। তারার ক্ষেত্রে 'ভ্রমণ' 'বলন' ও 'বিবর্তন' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ভ্র-ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে প্রায়ই 'উৎক্ষেপ'। নাসিকার ক্ষেত্রে 'নতা' ও 'বিকৃষ্টা'র প্রয়োগ হয়।

চিত্র : ঘটোৎকচ চরিত্রে মুখায়বে বিস্ময় রসের বহিঃপ্রকাশ ও দুই হস্তে মুষ্টি মুদ্রার ব্যবহার

চিত্র : মুষ্ঠি

এছাড়াও এই চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে মণিপুরী নৃতের বোল মৌখিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। এই মৌখিক বোলের সাথে আবহ সংগীতে সংযুক্ত হয় পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ। এভাবে মুখবোল ও বাদ্যযন্ত্রের এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্ট আবহ ও তালের ছন্দ ঘটোৎকচ চরিত্র উপস্থাপনে একটি ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। ঘটোৎকচ চরিত্রের শিশুসুলভ আচরণ, অস্থিরতা, চাঞ্চল্যতা, রাগ প্রদর্শন, ক্ষিপ্ত আচরণ এ সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী আঙ্গিক ও মুখবোলের যুগ্ন প্রয়োগ এই চরিত্রায়নের জন্য খুবই প্রাসংঙ্গিক।

ব্রাহ্মণ পরিবার

ঘটোৎকচ এর বিপরীতে ব্রাহ্মণ পরিবারকে সর্বদাই ঘটোৎকচ থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান নিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ পরিবারের পাঁচজন চরিত্র সর্বদাই কাছাকাছি বা একত্রে থাকে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলকেই কখনও সমপাদ, কখনও স্বস্তিক পদ, আবার কখনও ডান বা বাম পা কে সামনের দিকে ভাঁজ করে সেই পায়ের উপর ভর দিয়ে পেছনের পা কে, পেছনের দিকে প্রসারিত করে অবস্থান নিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন সংলাপ প্রয়োগের সময় পদ, হস্ত ও মস্তকের যুগ্ন ব্যবহার লক্ষণীয়। হাতের ব্যবহারের সাথে পা কখনও সামনে, পেছনে ও পার্শ্বে প্রসারিত হয়েছে যাকে অগ্রগামী, সমগামী বা অনুগামী বলা হয়। "হে দ্বিজগণ নাট্য প্রযোক্তাগণ কর্তৃক চরণদ্বয়ের প্রয়োগনুসারে হস্তদ্বয় (পদের) অগ্রগামী, সমগামী অথবা অনুগামী করণীয়"[৩০] কখনও আরামাণ্ডি, মাণ্ডি, ও চারী বিধান অধ্যায়ের উল্লেখিত ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থান আলীঢ়, প্রত্যালীঢ় স্থান ব্যবহৃত হয়। হস্তমুদ্রার মাঝে পতাক মুদ্রার সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়াও অসংযুক্ত মুদ্রার ত্রিপতাক, শিখর, সূচী, চতুর, হংসাস্য এবং সংযুক্ত হস্ত মুদ্রার অঞ্জলী, সম্পুট, পাশ, কপোতক, কর্কট, স্বস্তিক, ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চিত্র : দুই পদের মাঝে চার তাল দূরুত্বে সূচীমুখ হস্তে ঘটোৎকচ ও সমপদ অবস্থায় সম্পুট হস্তে ব্রাহ্মণ

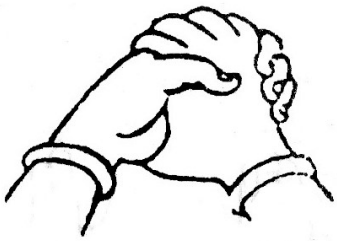

চিত্র : সম্পুট

এছাড়াও শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্যের অসংযুক্ত হস্ত মুদ্রার খটকামুখম, সংদংশ, মৃগশীষ্য, হংসাস্য, অলপল্লব, ভৃঙ্গ, অর্ধচন্দ্র, ত্রিশূল, কর্তরীমুখম, সূচীমুখম, শিখর ব্যবহৃত হয়। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত আভুগ্ন ও প্রকম্পিত বক্ষ, উন্নত ও বিবর্তিত পার্শ্ব, কম্পন ও উর্দ্বতন উরুর ব্যবহার লক্ষণীয়। চারী বিধান অন্তর্গত ভৌমি চারীর বদ্ধা, এড়কাক্রীড়িতা, স্যন্দিতা ও অপস্যন্দিতা, সমোৎসরিতমত্তল্লী এবং আকাশিকী চারীর পার্শ্বক্রান্তা, সূচী, আক্ষিপ্তা ও ভ্রমরী চারীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত নাটকে ব্রাহ্মণী চরিত্রের অভিনেতা ক্যাথরিন পিউরিফিকেশন বলেন,

> সংলাপ প্রক্ষেপণের সময় কখনও কখনও আরামাণ্ডি অবস্থানে থেকে আমরা শরীরের কটি অঞ্চল, উরু, জংঘা ও পাদ অংশকে নিশ্চল ও স্থির রেখে কোমর অঞ্চলের উর্ধাংশ বক্ষ, স্কন্ধ, হস্ত, ও মস্তকের অধিক ব্যবহার করেছি। ঘটোৎকচের ভয়ে কখনও ব্রাহ্মণ পরিবারের আমরা সকলই মাণ্ডি অবস্থান বা বসে অবস্থান নিয়েছি। আবার কখনও আমরা পাঁচজনই একত্রে ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। যখন পাঁচ জনই একই সাথে বিশেষ বোল এর মাধ্যমে বোলের লয় ও ছন্দের সাথে ছন্দময় চলন তৈরি করেছি। এই ছন্দময় চলন ও বাচিকাভিনয়ে বোলের ব্যবহারই ছিল উক্ত পরিবেশনার একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৩১]

যেখানে রায়বেঁশে নৃত্যের আঙ্গিকের বেশ কিছু চলন, ভঙ্গি, মুদ্রার সাথে রায়বেঁশে ও পাতানাচের মুখবোল ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের আঙ্গিকের সাথে রায়বেঁশে ও পাতানাচের মুখবোল এর প্রয়োগ ব্রাহ্মণ পরিবারের চলনের গতিতে বৈচিত্র্যময়, নতুনত্ব ও ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। রায়বেঁশে নৃত্যের আবিস্কারক ও 'বাংলার বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে' গ্রন্থের লেখক গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নৃত্য সম্পর্কে বলেন - "ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর বীরোচিত নৃত্যকলা ও অসাধারণ সামরিক ব্যায়াম-ক্রীয়া দেখিলে, ইহারা যে কেবল নামে নয় ; প্রকৃতি পরমপরায়ত্ত সহস্র বর্ষাধিক পূর্বেও বাঙালি 'রায়বেঁশে' যোদ্ধা-বীরদিগের বংশধর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারেনা।"[৩২] রায়বেঁশে শব্দটির অর্থ 'ভল্লধারী যোদ্ধা'। যোদ্ধার শৌর্য,শক্তি, যুদ্ধচাতুর্য, রণ তাণ্ডব প্রকাশ পায় এই নৃত্যের মাধ্যমে। রায়বেশে নৃত্যের এই আঙ্গিকের ব্যবহরের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলে ঘটোৎকচের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা ও তাকে প্রতিহত করার চেষ্টাও প্রকাশ পায়।

চিত্র : রায়বেঁশের ভঙ্গিতে ঘটোৎকচের কাছ
থেকে ছোট পুত্রের রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা

প্রথম চিত্রে রায়বেশের বিশেষ এই ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে ঘটোৎকচ ও ছোটপুত্র রূপদানকারী অভিনেতার মাঝে। এখানে ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণ পরিবারকে তার শক্তির প্রদর্শণ করছে ছোট পুত্রকে কোমরে ঝুলিয়ে দ্রুত গতিতে ঘুর্ণন-এর মাধ্যমে।

ভীম

ভীম চরিত্রের শক্তি, সাহস, বীরত্ব প্রথমেই প্রকাশ পায় যখন মঞ্চে প্রথম ভীমের প্রবেশ ঘটে। উক্ত নাট্য প্রযোজনায় ভীম চরিত্রকে মঞ্চে প্রথমবার দেখা যায় সে ব্যায়াম বা শরীর চর্চা করছে। নাট্য প্রয়োজনায় ভীমের এই শক্তিকে দেহ বিন্যাসের মাধ্যমে রূপক অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। ভীমের মতোই আরও তিন জন একই রকম আহার্য (পোশাক, অলংকার,রূপসজ্জা) ব্যবহারের মাধ্যমে ভীমের মতো অঙ্গভঙ্গি করে ভীমের ছায়ার মতো মঞ্চে উপস্থিত হয়, যেখানে অন্য তিন জনের আঙ্গিকও ভীমের মতো ব্যবহৃত হয়। যার ফলে ভীমের দুটি হাতের ব্যবহারকেই মনে হয় ৮টি হাতের মতো। এই দেহ বিন্যাস ভীমের শক্তির ব্যাপকতা প্রকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। স্কন্ধভেদ, বাহুভেদ ও কটিভেদের নানাবিধ ব্যবহার, হস্তমুদ্রার মুষ্ঠি হস্তের প্রয়োগ, সেই সাথে মণিবন্ধ ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে ভীমের গদা সহোযোগে নানাবিধ ব্যায়াম চর্চার ও শারীরিক কসরতের রূপ দৃশ্যত হয়। ভীমের সম্পর্কে ঘটোৎকচ যখন বলে– "সিংহের মতো এর মুখ, সিংহের মতো দাঁত, সুরার মতো উজ্জ্বল চোখ, [...] গতি গজেন্দ্রের মতো, স্কন্ধ উন্নত এবং বাহু দীর্ঘ। পরিস্কার বোঝা যায় অত্যন্ত বলশালী এই ব্যক্তি কোন বিখ্যাত বীর পুরুষের রাক্ষসী গর্ভজাত সন্তান।"[৩৩] তার এই সংলাপের আঙ্গিকাভিনয় দ্বারাও ভীমের বীরত্ব, বিশালত্ব, তার শক্তির প্রকাশ পায়। কেননা ভীমের চরিত্রায়নে ভীমের বিশালতা, শক্তি, বীরত্বের প্রকাশ আবশ্যক। ভীম চরিত্র

সম্পর্কে *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকের ভূমিকায় সুবুদ্ধি চরণ গোস্বামী বলেন, "পঞ্চ পাণ্ডবের মিলিত শক্তি আর ভীমের একার শক্তি তুল্যমূল্য। ভীমের বীরত্বব্যাঞ্জক আকৃতিও নয়ন মনোহর।"[৩৪]

চিত্র : ভীম ও সহচরদের চরিত্র প্রসারিত পদে এবং ভীমের দুই হস্তে
পতাক ও সহচরদের হস্তে মুষ্টি মুদ্রার ব্যবহার

ভীম ও ঘটোৎকচের লড়াই

ঘটোৎকচ যেমন ভীমের শক্তি, বীরত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছে। তেমনি ভীমও ঘটোৎকচের সাহসী আচরণ, স্পষ্ট বাক্যালাপ, মাতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, তেজদীপ্ত ও বীরত্বপূর্ণ দেহভঙ্গী দেখে সন্দেহ প্রকাশ করে ঘটোৎকচের কাছে তার মায়ের নাম জানতে চায়। প্রতিউত্তরে জানতে পারে হিড়ীম্বা তার মা। অর্থাৎ ঘটোৎকচ তার নিজেরই পুত্র। যখন ভীম জানতে পারে ঘটোৎকচ তারই সন্তান তখনই আত্মতৃপ্তিতে তার হৃদয় ভরে ওঠে তবুও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা যেহেতু তার ক্ষাত্রধর্ম এবং ঘটোৎকচের কাছে ভীমের প্রকাশ অপ্রকাশিত তাই শুরু হয় ভীমের রসিকতা। অতপর ভীম নানাভাবে ঘটোৎকচকে রাগিয়ে তোলে। যেমন:

> ঘটোকচ– আমি কে জান?
> ভীম– আমার পুত্র বলে জানি।
> ঘটোৎকচ– ভীরু লোকের অস্ত্র ধরেছ তো!
> ভীম– আমি সত্যের নামে শপথ করে বলছি ভয় কাকে বলে আমি জানিনা।
> ঘটোৎকচ– এই আমি তোমাকে ভয় শিক্ষা দিচ্ছি। অস্ত্র ধারণ কর।[৩৫]

তারপর ঘটোৎকচ নিজের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য বড় গাছ, পর্বতের চূড়া তুলে নিয়ে ভীমকে প্রহার করে কিন্তু এতে ভীমের কিছুই হয় না। ঘটোৎকচ তখন আরও রেগে গিয়ে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায়। এ পর্যায়ে দুজনের মাঝে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। একপর্যায়ে ভীমকে শক্তবাধনে বেধে ফেলে। তবুও মল্লযুদ্ধেও ভীমকে হারাতে পারে না। অতপর ঘটোৎকচ তার মায়ের কাছে থেকে শেখা

মায়াপাশের মন্ত্র জপ করে ভীমকে মায়াপাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু ভীম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এর সহযোগীতায় কমণ্ডলুর জল নিয়ে মন্ত্র জপ করে মায়াপাশ ছিন্ন করে। অবশেষে ঘটোৎকচ নিরুপায় হয়ে ভীমকে তার পুর্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করে তাকে অনুসরণ করতে বলে এবং ভীম তাতে রাজি হয়ে যায়।

ভীম চরিত্র রূপায়ণকারী ফাহমিদা তানজী বলেন:

> মধ্যমব্যায়োগ নাট্য প্রযোজনায় ভীম ও ঘটোৎকচ-এর এই অংশটুকু পরিবেশনায়, আঙ্গিকের ব্যবহার ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নান্দনিক। কেননা এখানে ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গের, উপাঙ্গের, মুখজক্রিয়ার নানাবিধ বিধিবদ্ধ প্রয়োগের পাশাপাশি রায়বেঁশে নৃত্যেরও বিভিন্ন চলন, ভঙ্গী, মুদ্রার ব্যবহার হয় এবং মণিপুরী নৃত্যের কিছু আঙ্গিক-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই তিন ধারার নৃত্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণ একদিকে ভীম ও ঘটোৎকচ চরিত্রের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নানাদিক উপস্থাপনে যেমন সহযোগী হয়েছে তেমনি রায়বেঁশে ও মণিপুরী নৃত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ মুখোবোলের প্রয়োগ নাটকের ভাব ও রস প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালি উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।[৩৬]

চিত্র : মল্লযুদ্ধে ভীম অলপদ্ম হস্তে ও ঘটোৎকচ মুষ্টি হস্তে লম্ফ অবস্থায় দুই পা প্রসারিত করে শক্তি প্রদর্শন

মণিপুরী 'পুঙলম' নৃত্যে মৃদংঙ্গের বোলের ছন্দে ছন্দে নৃত্য সংঘটিত হয়। এই পুঙলম নৃত্যের মৃদংঙ্গের বোল-কে মুখবোল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভীম ও ঘটোৎকচের বিভিন্ন দৃশ্যে যেমন- ঘটোৎকচ দ্বারা ভীমের উপর গাছ ও পাহাড় ছুড়ে দেওয়া, ভীমের শক্তি প্রদর্শন, ভীম ও ঘটোৎকচের মল্লযুদ্ধ। মুখবোলের পাশাপাশি এ সকল দৃশ্যে মণিপুরী মার্শাল নৃত্য আঙ্গিকের 'থাঙতা' ব্যবহৃত হয়। 'থাঙ' অর্থ 'তরোবারী' এবং 'তা' অর্থ 'বল্লম'। "তরোবারী ও বল্লম এর সাথে যে কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয় তাকে থাংকা বলে। থাঙতায় মুলত অস্ত্র সহযোগে যুদ্ধের নিয়মবদ্ধ কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়।"[৩৭] এই নাট্য প্রযোজনায় মল্লযুদ্ধের অংশ ছাড়াও বীরত্ব বা বীর রস প্রকাশের উপাদান হিসেবে মণিপুরীর মার্শাল নৃত্য আঙ্গিক থাংতা আঙ্গিকের কিছু চলন ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : ভীমের দণ্ডায়মান অবস্থানে বক্ষ উন্মুক্ত ও
ঘটৎকোচের বক্ষ আভুগ্ন ও প্রকম্পিত

উপরের ছবিতে দৃশ্যমান ভীম ও ঘটোৎকচের আঙ্গিককে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়-আঙ্গিকাভিনয়ের তিনটি ভাগের শারীরাভিনয়ের যে ৭টি ভাগ রয়েছে তা হলো- বক্ষ, পার্শ্ব, উদর, কটি, ঊরু, জংঘা ও পদ। সেই বিবেচনায় চিত্রে দেখা যায় ভীমের দণ্ডায়মান অবস্থানে বক্ষ উন্মুক্ত রয়েছে। যা নাট্যশাস্ত্র অনুসারে বক্ষভেদের নিভুগ্ন (বক্ষ) ভেদকে নির্দেশ করে, যার অর্থ অনমনীয়। সত্যকথন, উদ্ধতরূপে নিজকে উল্লেখ করা, মান করা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে নিভুগ্ন বক্ষ করণীয়। পাশাপাশি ঘটোৎকচের বক্ষ আভুগ্ন ও প্রকম্পিত অবস্থায় লক্ষণীয়। আভুগ্ন অর্থাৎ অবনমিত, প্রকাম্পিত (বক্ষ) ক্রমাগত বক্ষের স্ফীতি। এই দুই-এর মিশ্রিত প্রয়োগ লক্ষণীর। হাস্য, রোদন, পরিশ্রম, ত্রাস পরিস্থিতিতে প্রকম্পিত বক্ষের ব্যাবহার করণীয়। ঘটোৎকচের পার্শ্ব প্রয়োগে নত ও প্রসারিত এবং ভীমের পার্শ্বের ব্যাবহারে উন্নত পার্শ্ব ব্যবহার হয়। উদরের মধ্যে ভীম পূর্ণ উদর এবং ঘটোৎকচ খল্ব উদর ব্যবহার করে। কটির প্রয়োগে ভীম ও ঘটোৎকচ উভয়েরই কটি ক্রিয়াশীলভাবে স্থির। ভরত যাকে রেচিতা বলেছেন। ভীম মেরুদণ্ড স্থির রেখে রেচিতা ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে ঘটোৎকচ খল্ব উদরের সাহায্যে মেরুদণ্ড স্থির করে রেচিতা কটি ব্যবহার করেছেন। উরু, জংঘা ও পদ- দুই চরিত্রই সমান বা সমপাদ অবস্থায় রয়েছে। উভয়ই চরিত্রই ভীষণ শক্তিশালি হলেও পরিস্থিতি বা অবস্থা ভেদে শারীরিক কাঠামোরও পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ ছবিতে পাওয়া যায়। চিত্রে ভীম উৎক্ষিপ্ত মস্তক ক্রিয়া এবং ঘটোৎকচ আংশিক অঞ্চিত অবস্থায় অনেকটাই কম্পিত মস্তক প্রয়োগ করেছেন। যা দ্বারা ক্রোধ, বিশেষভাবে বোঝার চেষ্টা, চিন্তিত বোঝায়। হস্তমুদ্রার মধ্যে ভীম দুই হাতেই মুষ্টি হস্ত ব্যবহার করেছে প্রসারিত ভাবে। অন্যদিকে ঘটোৎকচ দুই হাতকেই নিতম্বের পেছনে রেখেছে। ভীমের দৃষ্টি বিষ্ফোরিত এবং চক্ষু তারকা উজ্জল। এই দৃষ্টি *অভিনয় দর্পণ* অনুযায়ী 'আলোকিত' দৃষ্টির নির্দেশ করে। চিত্রে ভীমের এই দৃষ্টি নাট্যশাস্ত্র মতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এটি 'বীরা', ' ক্রদ্ধা' ও 'শংকিতা' দৃষ্টি নির্দেশ করে যা যথাক্রমে রসদৃষ্টি, স্থায়ীদৃষ্টি এবং সঞ্চারী দৃষ্টির অন্তর্গত। 'বীরা' এই

দৃষ্টিতে 'তারা' উৎফুল্ল হয়ে সমভাবে মধ্যভাগে থাকে। 'ক্রুদ্ধা' অক্ষিপুট রুক্ষ, স্থির এবং উর্ধ্বমুখী হয়। 'শংকিতা' কিছুটা চঞ্চল, কিছুটা স্থির, কিছুটা বিস্তৃত এবং একটু ঊর্ধ্বমুখী হয়। উপরোক্ত বর্ণিত দৃষ্টিসমূহ দ্বারা ভীমের দৃষ্টি বর্ণনা সম্ভব। অন্যদিকে ঘটোৎকচ এর দৃষ্টিকে অভিনয়দর্পণ অনুযায়ী সাচী দৃষ্টির অন্তর্গত বলে পরিলক্ষিত হয়। বার বার তীর্যকভাবে কটাক্ষপাত করলে সাচী দৃষ্টি হয়। "Saci (sidelong): looking out of the corners of the eyes,without moving the head,usage ; secret purpose(ingita), twirling the moustache (self confidence), aiming an arrow, hinting,and in kulata natya."[৩৮] নাট্যশাস্ত্রমতে ঘটোৎকচ এর দৃষ্টিতে রসদৃষ্টি 'অদ্ভুতা', স্থায়ীদৃষ্টি 'দৃপ্তা' ও সঞ্চারীদৃষ্টি 'বিভ্রান্তা' দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। ভীম ও ঘটোৎকচ উভয় চরিত্রে চলনের ক্ষেত্রে মণিপুরী নৃত্যের বেশকিছু চলন বা গতির প্রয়োগ করা হযেছে। যেমন – গজগতি, সর্পগতি, অশ্বগতি। মণিপুরী ভাষায় যা সামোপাজাৎ, লাইরেন মাথেক ও সগোল সাজেৎ নামে পরিচিত।

এই নাট্য প্রযোজনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – নাটকে ঘটোৎকচ ও ভীম দুইটি চরিত্রই পুরুষ চরিত্র হলেও, প্রযোজনায় এই দুইটি চরিত্রের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছে দুজন নারী। নারী হিসেবে পুরুষ চরিত্রের চরিত্রায়নে তাদের বেশভুষা, অঙ্গসজ্জা, রূপসজ্জা, অলংকার অর্থাৎ আহার্যাভিনয়ের পাশাপাশি, আঙ্গিকাভিনয় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এখানে তাণ্ডব শক্তি প্রদর্শনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আঙ্গিকাভিনয়। একজন অভিনেতার শরীরে দুই রকমের শক্তির রূপ থাকে। তাণ্ডব শক্তি ও লাস্য শক্তি। " 'নাট্যশাস্ত্রে' নৃত্ত দ্বিবিধ– তাণ্ডব ও লাস্য। প্রথমটি প্রচণ্ড, দ্বিতীয়টি কোমল।"[৩৯] তাণ্ডব নৃত্য মূলত এমন একধরনের নৃত্য যার সৃষ্টি হয়েছে ভগবান শিব থেকে। "ভগবান (শিব) রেচক, অঙ্গহার ও পিণ্ডীবন্ধ সৃষ্টি করে তণ্ডুমুণিকে দিয়েছিলেন। তিনি এগুলো থেকে সম্যকরূপে গীত ও বাদ্য যুক্ত যে নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন তা তাণ্ডব নামে বিদিত।"[৪০] তাণ্ডব প্রসংগে নৃত্যশিল্পি অনিন্দিতা ঘোষ বলেছেন, "বীর, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি রসের প্রাধান্য। অঙ্গহারগুলি উদ্ধত প্রয়োগ হয়। [...] তাণ্ডবের দুইটি রূপের নাম– লেবলি ও বহুরুপ। লেবলি নৃত্যে অঙ্গ বিক্ষেপই বেশি, অভিনায়ংশ কম এবং বহুরূপে চোখমুখের বিভিন্ন ভঙ্গির মাধ্যমে ভাব প্রকাশকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।"[৪১] নান্দীকেশর তার অভিনয় দর্পণ এ নাট্য,নৃত্ত্ ও নৃত্য এই তিনটিতেই তাণ্ডবের উপস্থিতি প্রসংগে বলেন – "There is a twofold division of these three, Lasya and Tandava.Lasya dancing is very sweet,Tandava dancing is violent."[৪২]

হিড়িম্বা

হিড়িম্বা চরিত্র রূপায়ণে হিড়িম্বার চতুর্দিকে আরও কিছু মুখের আবয়ব তৈরি করা হয়। যেখানে মুখের রূপসজ্জায় নীল রং, ও মুখমণ্ডলে অংকিত বিভিন্ন রেখার ব্যবহার রাক্ষসী চরিত্র রূপায়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ভরতনাট্যম নৃত্যের কিছু মুখোবোলের সাথে নানাবিধ মুখজ ক্রিয়া, দৃষ্টিভেদ, তারার ক্রিয়া, ভ্রুক্রিয়া, মস্তক ক্রিয়ার মাধ্যমে হিড়িম্বা চরিত্রের চরিত্রায়ণ করা হয়।

তেইতেই ধাত্তা ধিত্তেইধাত্তা তেইতেই ধাত্তা ধিত্তেইধাত্তা
তেইতেই ধাত্তা ধিত্তেইধাত্তা তেইতেই ধাত্তা ধিত্তেইধাত্তা

উপরিল্লেখ্য বোলের সাথে হিড়িম্বা ও তার সাথের কোরাস দল বিভিন্ন মুখজক্রিয়া সহযোগে আরামাণ্ডি ভঙ্গিতে বসে কখনও অগ্রতলসঞ্চর পদ প্রয়োগ করে আবার কখনও চারীভেদের এড়কাক্রীড়িতা, ঊরুদ্বৃত্তা, বদ্ধা, অড্ডিতা ভৌমিচারীগুলো ব্যবহার করেছে। হিড়িম্বা ও কোরাসের এই পরিবেশনার পুরোটাই তাণ্ডব শক্তির আধিক্য সম্পন্ন। যার ফলে হিড়িম্বা চরিত্রের আবেগের উৎকণ্ঠা, ছেলের ফিরে আসার অপেক্ষার অস্থিরতা, রাক্ষসী হিসেবে তার বন্য আচরণ, এ সকল বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে আঙ্গিকাভিনয়ের প্রয়োগ মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

চিত্র : হিড়িম্বা ও কোরাস দল আলোকিত দৃষ্টিরত অবস্থায় প্রলোকিত দৃষ্টি চালনায় থেকে মুখরাগের রক্ত পর্যায় এবং উপাঙ্গসমূহের ক্রিয়া প্রকাশ

ভরতবাক্য

ভরতবাক্যে প্রত্যেক চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থিত দেখা যায়। সকলে একত্রে ভরতবাক্যে অংশগ্রহণ করে। পুরো ভরতবাক্যই ভরতনাট্যমের বোলবানী সহকারে ভরতনাট্যম নৃত্য আঙ্গিক ব্যবহারে সম্পন্ন হয়। ছন্দে ছন্দে আঙ্গিকের প্রয়োগের ফলে পুরো ভরতবাক্যই হয় নৃত্য নির্ভর।

উপসংহার

মধ্যমব্যায়োগ নাট্য প্রযোজনায় আঙ্গিকাভিনয়ে নাট্যশাস্ত্র অনুসৃত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সহযোগে বিভিন্ন আঙ্গিক প্রয়োগের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্য, যেমন- ভরতনাট্যম, মণিপুরীর পুঙচোলম, থাংচা প্রভৃতি নৃত্যের ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী নৃত্যের পাশাপাশি লৌকিক বা লোক নৃত্য রায়বেঁশের প্রয়োগও হয়েছে। এ ছাড়াও মণিপুরী, ভরতনাট্যম, রায়বেঁশে ও পাতানাচের

মুখবোলের সাথে ছন্দাময় গতি বা চলন এই নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং *মধ্যমব্যায়োগ* প্রযোজনা ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসুত ধ্রুপদী নাট্য প্রযোজনা হলেও নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক সংকেতাবদ্ধ আঙ্গিকাভিনয়ই কেবল নয় বরং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ও দেশীয় নৃত্য আঙ্গিকের মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। ফলে নাট্যশাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে প্রযোজনার আঙ্গিক নির্মিত হলেও অন্যান্য শাস্ত্রীয় ও দেশীয় নৃত্য আঙ্গিকের প্রয়োগ এই প্রযোজনা একটি নৃত্যাত্মক গবেষণামূলক ধ্রুপদী নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। *মধ্যমব্যায়োগ* নাট্য প্রযোজনায় ধ্রুপদী ও বিভিন্ন লোকজ আঙ্গিক ব্যবহার এই নাটকটিকে একটি অনন্যমাত্র যুক্ত করেছে। বর্তমান নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই আঙ্গিকাভিনয় রীতি বা কৌশল অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গবেষণার কাজে এই আঙ্গিকাভিনয়ে নিরীক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র

১. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় [অনু.], *ভাস*, (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯৭
২. ধনঞ্জয়, সীতানাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস [সম্পা.], *দশরূপক*, (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৯৯৭), পৃ. ৮
৩. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভাতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, (কলিকাতা: সাহিত্য নিকেতন, ১৯৮০, পৃ. ৭৪
৪. Manomohan Gosh, *Nandikesvara's Abhinayadarpanam*, (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1957), p. 20
৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (৩য় খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৬), পৃ. ১৯
৬. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় [অনু.], *ভাস*, (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯৮
৭. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৭), পৃ. ১৯৭
৮. প্রাগুক্ত
৯. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের নৃত্যকলা*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনা, ২০১৬), পৃ. ৩৫
১০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৭), পৃ. ১৯৮
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
১৪. Adya Rangacharya, *The Nātyaśāstra: English Translation with Critical Notes*, (New Delhi: Munshiram Manoharial Publishers Pvt Ltd, 1996), p. 80
১৫. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের নৃত্যকলা*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনা, ২০১৬), পৃ. ১৪৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০
১৮. প্রসূন বসু [সম্পা.], *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (১০ম খণ্ড), (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ৯৪
১৯. ইরা আহমেদ, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (চট্টগ্রাম: ১৫ অক্টোবর ২০২২)
২০. ওয়ার্দা রিহাব, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (ঢাকা: ১০ অক্টোবর ২০২২)
২১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯০), পৃ. ২৪
২২. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের নৃত্যকলা*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনা, ২০১৬), পৃ. ৮৬
২৩. ওয়াহিদা মল্লিক, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (ঢাকা: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২)
২৪. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯০), পৃ. ৩১
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মন, *আঙ্গিক অভিনয়*, (কোলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ২০০১), পৃ. ৮৩

২৭. সাইদুর রহমান লিপন, *অভিনয় অনুশীলনের সূত্রসন্ধান মারমা. মনিপুরী. গারো নাট্যকলা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০২২), পৃ. ১২৩

২৮. Suzuki, Tadashi, J. Thomas Rimer [Translated], *The Way of Acting: The Theatre Writing of Tadashi Suzuki*, (Newyork: Theatre Communication Group, 1985), p. 19

২৯. গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মন, *আঙ্গিক অভিনয়*, (কোলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ২০০১), পৃ. ১৪

৩০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯০), পৃ. ৫২

৩১. ক্যাথরিন পিউরিফিকেশন, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (ঢাকা: ২ নভেম্বর ২০২২)

৩২. গুরুসদয় দত্ত, *বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে*, (কলিকাতা: বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ১৯৯২), পৃ. ২২

৩৩. প্রসূন বসু [সম্পা.], *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (১০ম খণ্ড), (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ৯৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩৬. ফাহমিদা তানজী, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (চট্টগ্রাম: ১৬ অক্টোবর ২০২২)

৩৭. ওয়ার্দা রিহাব, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, (ঢাকা: ১০ অক্টোবর ২০২২)

৩৮. Ananda Coomaraswamy & Gopala Kristnayya Duggirala, *The Mirror of Gesture Being the Abhinaya Darpana of Nandikesvara*, (London: Cambridge Harvard University Press, 1917), p. 21

৩৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.], *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৯৯৭), পৃ. ২৮

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৪১. অনিন্দিতা ঘোষ, *ভরতনাট্যম ও ওড়িষী নৃত্যের রূপরেখা*, (কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ১১০

৪২. Ananda Coomaraswamy & Gopala Kristnayya Duggirala, *The Mirror of Gesture Being the Abhinaya Darpana of Nandikesvara*, (London: Cambridge Harvard University Press, 1917), p. 14

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান ও করণীয়

লুৎফুন্ নাহার*

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ভয়াবহতায় যখন ইউরোপ ও জাপান ক্ষত-বিক্ষত তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে পরাশক্তি রূপে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়াত ইউনিয়ন। বিপুল পারমানবিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত পরাশক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বের পরিমণ্ডল পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে অন্তর্ভূক্তকরণ প্রক্রিয়ার দরুন পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয় ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে। বিশ্ববাসী চার দশকের বেশি সময় ধরে বিদ্যমান স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে সমাজতন্ত্রের উপর উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের জয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের অধিক্ষেত্র। বর্তমানে চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈরি আন্তর্জাতিক পরিবেশে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সদর্পে টিকে থাকা, এই মার্কিন অধিক্ষেত্রের পরিসীমা ধীরে ধীরে সংকুচিত করে ফেলছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবারো বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে রাশিয়া চীনকে সঙ্গী করে পরাশক্তির ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বকে জানান দিচ্ছে এক পরিবর্তিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার – যাকে বলা হচ্ছে শি-পুতিন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। নতুন এই বিশ্ব-ব্যবস্থা অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। এই প্রবন্ধে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক জোট, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক কূটনীতি।

ভূমিকা

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলমান এই যুদ্ধ বিশ্ব-অর্থনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ধরনের পট পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট ব্যাপক ভিত্তিতে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতে ইইউ-সহ আরো কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র অতি উচ্চ মাত্রায় রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যদিও সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অর্থনৈতিক অস্ত্ররের ব্যবহার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন নয়, তবে এটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০১৪ সালের ইউক্রেনীয় বিপ্লবের পর রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি

* এম.ফিল. গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভ্লাদিমির পুতিন একই বছরের ১৮ই মার্চ ক্রিমিয়াকে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করলে রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয় তার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল রাশিয়ার উপর অধিকাংশ পশ্চিমা দেশসমূহ কর্তৃক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ। বর্তমানে রাশিয়ার উপর ব্যাপক পরিসরে আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে এই নেতিবাচক প্রভাব রুশ অর্থনীতির তুলনায় ইইউ ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনীতিতে বেশি। রাশিয়ার উপর আরোপিত এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন বলেছেন "the toughest sanctions the world has ever seen".[১] এই কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সফল করতে স্বয়ং ইইউকে নতুন অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি অন্যতম। এমতাবস্থায় রাশিয়ার উপর আরোপিত কঠোর এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে সফল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরাষ্ট্রকে পাশে পাচ্ছে না। যা বিশ্ব রাজনীতির বহু প্রচলিত সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শক্তি ভারত কোয়াডের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের সমন্বয়ে গঠিত চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ) সদস্য হয়েও রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানি বৃদ্ধি করেছে। অনুরূপভাবে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো মিত্র সৌদি আরব চলমান এই নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে ২০২২ সালে রাশিয়া থেকে রেকর্ড পরিমাণ পরিশোধিত তেল আমদানি করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া এই অর্থনৈতিক অস্ত্ররের ব্যর্থতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিন দশকের অধিক সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চলমান একমেরু (Unipolar) বিশ্ব ব্যবস্থাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন ডলারের একক আধিপত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বহু বছর ধরে যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে তা খর্ব করতে সম্প্রতি চীনের নেতৃত্বে 'ডি-ডলারাইজেশন' (De-dollarisation) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে অন্য কোন মুদ্রায় লেনদেনের প্রক্রিয়া যাকে ডি-ডলারাইজেশন নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অবন্ধু দেশের সাথে কাছের বন্ধু জাপান ও ভারতের মত দেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে চীন তার অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের কর্তৃত্বের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সমীকরণ যুগপৎভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহু হিসেব-নিকেশ পাল্টে দিচ্ছে যা নতুন এক বিশ্ব-ব্যবস্থা তৈরির পথকে সুগম করছে।

শি-পুতিন নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা

নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা (New World Order) প্রত্যয়টি পূর্বে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের (Conspiracy theory) সাথে বহুল ব্যবহৃত হলেও, প্রত্যয়টি সর্বাধিক আলোচনায় আসে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের

প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশের প্রদত্ত ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে। তাতে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারণ করেন:

> Time and again in this century, the political map of the world was transformed. And in each instance, a new world order came about through the advent of a new tyrant or the outbreak of a bloody global war, or its end. Now the world has undergone another upheaval, but this time, there's no war.[২]

ইরাকের কাছ থেকে কুয়েতকে পুনরুদ্ধার করতে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ অনুমোদিত যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের বিজয়ের পর তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ৬ মার্চ ১৯৯১ সালে কংগ্রেসে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই প্রত্যয়টি পুনরায় ব্যক্ত করেন এ রূপে: "Now we can see a new world coming into view. A world in which there is a very real prospect of a new world order."[৩] ১৯৯১ সালে শীতল যুদ্ধের (Cold war) অবসানে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের বার্তা দিতেই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ব্লক এবং সমাজতন্ত্রের পতনে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি, শক্তিসাম্য নীতি (Balance of power), জাতিসংঘের অধীন একটি একক ওয়ার্ল্ড গভর্মেন্ট, বিশ্বায়ন (Globalization), উদারবাদ (Liberalism), মুক্ত অর্থনীতি বিষয়সমূহ আলচ্য বিষয় হয়ে উঠে এই নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায়, যার মূল নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি একমেরু বিশ্ব-ব্যবস্থা তৈরি করতে ও টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক রাজনীতি এই অসম একমেরু বিশ্ব-ব্যবস্থার কাঠামো থেকে বের হতে পারেনি।

নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। ঐতিহসিকভাবেই বিশ্ব আধিপত্য (World hegemony) বিস্তারের এই লড়াইয়ের অন্যতম দিক হচ্ছে পরাশক্তি (Superpower) কর্তৃক বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠনের পাশাপাশি নিজ মতাদর্শের একটি একক ওয়ার্ল্ড গভর্মেন্ট গঠন। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সমাজতন্ত্রের উত্থান শতাব্দীর শেষ দিকে সেই সমাজতন্ত্রের পতনে বিশ্বে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে পুঁজিবাদের জয়ের মাধ্যমে বিশ্বকে একমেরু কাঠামোতে পরিনত করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিশ্বে নতুন ব্যবস্থা তৈরি হয় বৃহৎ শক্তিসমূহের নিজেদের মধ্যকার বৃহৎ কোন লড়াই শেষে বড় কোন শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার চলমান এই যুদ্ধকে অনেক সামরিক বিশ্লেষক রাশিয়া ও ন্যাটোর ছায়া যুদ্ধ (Proxy war) হিসেবে অবহিত করেছেন। "এই যুদ্ধটি চলছে ২০১৪ সাল থেকে, যখন থেকে ন্যাটো জোট ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে চলছে। কাজেই এই সংঘাত রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের হলেও, বহু বছর ধরেই ন্যাটো জোট ইউক্রেনকে মদদ যুগিয়েছে, আর সে

কারণেই এটিকে একটি পরোক্ষ যুদ্ধ বলে বর্ণনা করছি।"[৪] এই ছায়া যুদ্ধ গত শতাব্দীর শীতল যুদ্ধের সময়ের মত বিশ্বকে আবারো পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যা বিশ্বের পরাশক্তিসমূহের পারস্পারিক দ্বন্দ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনকে আরো বেশি সংঘাতপূর্ণ করে তুলছে।

বিশ্ব গত শতাব্দীতে চীনের যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সফল্যের সাক্ষী হয়েছে তা চলমান একবিংশ শতাব্দীতে চীনকে অর্থনৈতিক পরাশক্তির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম পরাশক্তি করে তুলছে। বাস্তববাদী (Realist) দৃষ্টিকোণ থেকে পরাশক্তি চীন স্বাভাবিক নিয়মেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের আধিপত্য বৃদ্ধি করে একমেরু ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। এ পরিবর্তনকে বাস্তব রূপ দিতে চীন সহযোদ্ধা হিসেবে রাশিয়াকে বেছে নিয়েছে। রাশিয়ায় ২০২৩ সালের ২০-২২ মার্চ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একত্রে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির তিনদিন পর চীনা রাষ্ট্রপতি শি-র মস্কো সফরের সময়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সফরের এক মাস পূর্বে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের এক বছর পূর্তিতে নিজেকে 'নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে তুলে ধরে শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত বন্ধে ১২ দফা প্রস্তাব দিয়েছিল চীন। যদিও ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি এ প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করতে চীনা রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ এ প্রস্তাবকে অগ্রহণযোগ্য বলে মত দেন। শেষ পর্যন্ত শি-র রাশিয়া সফর আরো একবার এ যুদ্ধে চীনের সমর্থন কোন দিকে তা স্পষ্ট করে তোলে। এ সফরের প্রধান চমক ছিল চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর এই বক্তব্যটি: "Now there are changes that haven't happened in 100 years. When we are together, we drive these changes.[৫] "I agree."[৬] বলে পুতিন বক্তব্যটি সমর্থন করেন। চীনের পক্ষ থেকে আরো বলা হয় যে: "They [the leaders] shared the view that this relationship has gone far beyond the bilateral scope and acquired critical importance for the global landscape and the future of humanity."[৭] যে বিশ্ব শান্তি ও মানবতাকে পুঁজি করে এতোদিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছে সেই মানবতার গাঁথাই এখন শি-পুতিন নতুন সুরে গাইছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এককভাবে মানবতার ত্রাণকর্তা সাজার সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে ক্রেমলিনের ওয়েবসাইটে পুতিনের ভাষ্য:

> We are working in solidarity on the formation of a more just and democratic multipolar world order, which should be based on the central role of the U.N., its Security Council, international law, the purposes and principles of the U.N. Charter.[৮]

শি-পুতিন সম্প্রতি যে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার তৈরির আশা ব্যক্ত করেছেন তা চলমান সংকটে রাশিয়ার প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের আরোপিত কঠোর

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ব্যর্থতায় নিকটবর্তী বলেই অনুমেয়। ইরান, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার উপর দীর্ঘ সময় ধরে চলমান বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেশসমূহ সময়ের সাথে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে এখন বহু দেশ চীনের নেতৃত্বে মার্কিন বিরোধী বিভিন্ন জোটে যোগদানে আগ্রহী, এতে ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) অন্যতম। ব্রিকস হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গঠিত একটি অর্থনৈতিক জোট। পৃথিবীর ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা ধারণকারী দেশমূহের এ জোট বর্তমানে ডি-ডলারাইজেশন প্রকিয়ায় নিজেদের সক্রিয় করে তোলেছে। ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি জাপান, সৌদি আরব ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের পরিবর্তে নতুন একটি বৈশিক মুদ্রা চালুর চেষ্টা করছে যাতে চীনা মুদ্রা ইউয়ান বহুলাংশে এগিয়ে আছে, তাছাড়া এই জোটের রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনের প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে। অপরদিকে এসসিও-তে রয়েছে চীন, ভারত, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান তবে সম্প্রতি ইরানকে পর্যবেক্ষক দেশ থেকে সদস্য দেশ করার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ বছরের এপ্রিল মাসে সংস্থাটির সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে দেশটি পূর্ণ সদস্য দেশের মর্যাদা অর্জন করবে। অনেকেই এসসিও জোটকে ন্যাটোর প্রতিপক্ষ জোট হয়ে উঠার শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। একই সাথে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় চীন বিভিন্ন দেশে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে তার প্রভাব বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। ব্রিকস ও এসসিও জোটের সদস্য দেশসমূহ মার্কিন নের্তৃত্বাধীন পশ্চিমা একক আধিপত্যের পরিবর্তন করতে বদ্ধ পরিকর। তবে পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা যে দ্বিমেরুর (Bipolar) পরিবর্তে বহুমেরু (Multipolar) সম্পন্ন হবে তা চলমান বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট:

> President Xi and Putin have made it clear that their goal is to jointly work toward a multipolar world order. This means combining to rebuff and to limit the present global hegemon and its NATO war machine.[৯]

শি-পুতিনের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা ঘোষণার পরের মাসেই ইইউ-র অন্যতম শক্তিশালী দেশ ফান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের সাথে দেশটির যে বড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে তা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশটি অনেক বেশি সক্রিয়। তার মতে ইউরোপকে তার কৌশলগত সার্বভৌমত্বের (strategic autonomy) জন্য মার্কিন নির্ভরতা কমাতে হবে। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হলো:

> The paradox would be that, overcome with panic, we believe we are just America's followers. The question Europeans need to answer ... is it in our interest to accelerate [a crisis] on Taiwan? No. the worse thing would be to think that we Europeans must become followers on this topic and take our cue from the U. S. agenda and a Chinese overreaction.[১০]

শি-পুতিন ঘোষিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা নিকটবর্তী মনে করেই তিনি ইউরোপকে ফান্সের নেতৃত্বে তৃতীয় পরাশক্তির (third superpower) অবস্থানে দেখতে চায়। চীন-তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ইউরোপকে চীনের সাথে কোন বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কে না জড়িয়ে এক চীন (One China) নীতিতে অবস্থানের যে বার্তা ম্যাক্রোঁ বিশ্বকে দিয়েছেন তাতে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের মধ্যে চীনের আঞ্চলিক আধিপত্য (Regional hegemony) মেনে নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। সেই সাথে ভারতও এই বহুমেরু ব্যবস্থায় নিজের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সদা তৎপর। ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে ২০১৯ সালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তার বক্তব্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা অর্জনের দাবি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে। এ বক্তব্যে তিনি বলেন:

> If you have a United Nations where the most populous country in the world - may be in 15 years - with the third largest economy is not in the decision-making process, I grant you, it affects the country concerned. But I would also suggest it affects the United Nations' credibility.[১১]

যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র ফান্স ও ভারত নিজ স্বার্থে একমেরু ব্যবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেওয়ার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছে। দেশ দুটি তাদের নিজেদের শক্তি ও গুরুত্বের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ভারত একটি বিষয়ে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছে যে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের বর্ধিত আধিপত্যকে ঠেকাতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতকে প্রয়োজন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের দরুন এ অঞ্চলকেন্দ্রিক চীনের বিরুদ্ধে যে কোন নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে পশ্চিমা বিশ্বকে ভারতকে পাশে রাখতে হবে। বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ ভারত যুক্তরাজ্যকে পিছনে ফেলে সম্প্রতি বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। এ সাফল্যে ভারতের রাশিয়া থেকে স্বল্প মূল্যে ব্যাপক জ্বালানি তেল আমদানি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। রাশিয়া ভারতের দীর্ঘ সময়ের বন্ধু ও ভারত রাশিয়া থেকে প্রচুর সমরাস্ত্র ক্রয় করে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত কখনই আরেক পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশি দেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ককে পছন্দ করে না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভারত যখন রাশিয়া থেকে এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করে তখন অনেকেই ভারতকে তুরস্কের মত নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে বলে আশঙ্কা করলেও আদতে তা ঘটেনি। ভারতকে তাই যুক্তরাষ্ট্র অন্য মিত্রদের মত বিশ্বাস করে না। যা ভারতের বিভিন্ন মার্কিন জোটভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায় অধিক আগ্রহী হবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে।

শি-পুতিন ঘোষিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা যে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যকে খর্ব করতে তৈরি হচ্ছে তা জ্ঞাতসারেও বহু মার্কিন মিত্র এ পরিবর্তনে খুশি। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যে একক মার্কিন কর্তৃত্ব ছিল তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেন সৌদি আরব সফর করে জ্বালানি তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বলা সত্ত্বেও

মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশটি উল্টো তেল উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ পরিশোধিত তেল আমদানি করেন। টানা দুই বছর ধরে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তিতে ইরানকে ফেরানোর চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ব্যর্থ সেখানে চরম গোপনীয়তায় চলতি বছরের ১০ মার্চ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চীন তার অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে পারস্য উপসাগরীয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সফল হয়েছে। এ ঘটনা চীনকে বৈশ্বিক মধ্যস্থতাকারী (Global mediator) হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এ রকম বহু ঘটনা বিশ্বে চীনের কর্তৃত্বের জানান দিচ্ছে। তাই শি-পুতিন ঘোষিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে বিশ্বে মার্কিন একক আধিপত্যের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে:

> While the two leaders have met many times before, this meeting showed the two countries' commitment to creating a new world order, one where the U. S. is no longer the arbiter of everything that happens on the global stage.[১২]

বাংলাদেশের অবস্থান

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় শি-পুতিন ঘোষিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান কি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তা অতি গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চলমান মার্কিন আধিপত্য ও চীনের আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা পুরো পৃথিবীর তুলনায় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি করবে যদিও পরোক্ষভাবে এই চাপ ইতোমধ্যে দেশসমূহের উপর অনুভূত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। মার্কিন কতৃত্বের একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মার্কিন আধিপত্যের সমকক্ষ চীনের কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে বহুমেরু কেন্দ্রিক যে নতুন বিশ্বের জানান শি-পুতিন দিচ্ছেন তা বাংলাদেশের মত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রের জন্য বেশ কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে। পরাশক্তি কর্তৃক বিভিন্ন জোট গঠনের মাধ্যমে নিজের নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখার এই পুরনো পদ্ধতি সময়ের বিবর্তনে এখনও টিকে আছে। জোট গঠনের এই বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশকেও তার নিজের অবস্থান বাছাই করতে মার্কিন প্রশাসন কূটনৈতিক চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে চলমান জটিল বিশ্ব রাজনীতি নতুন এক শীতল যুদ্ধ শুরুর পূর্বাস্থা নির্দেশ করছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান ও করণীয় উভয়ই নির্ধারণ সময়ের সাথে কঠিনতর হচ্ছে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে জাতিসংঘে গৃহীত চারটি প্রস্তাবের একটিতে ভোট প্রদান ও বাকি তিনটিতে ভোট দানে বিরত ছিল বাংলাদেশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক মাসের মধ্যে ২ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার নিন্দা করে আনীত প্রস্তাবে চীন, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মত বাংলাদেশও ভোট দানে বিরত থাকে যেখানে ১৪১ টি রাষ্ট্র প্রস্তাবটির পক্ষে, ৭টি বিপক্ষে এবং ৩২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পর

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভোটাভোটিতে হুবহু একই ফলাফল আসে এবং এবারও পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ ভোট দানে বিরত থাকে। যার প্রেক্ষিতে রুশ দূতাবাস এক টুইটবার্তায় বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। প্রতিবার ভোট দানে বিরত থাকার যুক্তি ছিল যে, বাংলাদেশ রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। ইউক্রেনে সৃষ্ট মানবিক সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনীত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় বাংলাদেশ, এ অবস্থান পরিবর্তনের করণ বলা হয়েছে মানবিকতা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০২২ সালের ৩০ মার্চ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই বছরের ২ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউক্রেনে অবিলম্বে রাশিয়ার হামলা বন্ধে আনীত প্রস্তাবে বাংলাদেশের ভোটদানে বিরত থাকা এবং ২৪ মার্চ ইউক্রেন বিষয়ে উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দানের বিষয়ে বলেন:

> যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা নাই, সেখানে কোন বিষয় নাই। একটা দেশের বিরুদ্ধে ভোট, সেটা হলো রাশিয়া। তখন আমি বললাম, না, এখানে তো আমরা ভোট দেবো না। কারণ যুদ্ধ তো একা একা বাধে না। উস্কানি তো কেউ না কেউ দিচ্ছে। দিয়ে টিয়ে তো বাঁধালো যুদ্ধটা। তাহলে একটা দেশকে কনডেম (নিন্দা) করা হবে কেন? সেই জন্য আমরা ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিলাম।[১৩]

বাংলাদেশের মহন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে আনিত একাধিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দেয় রাশিয়া। আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের তীব্রতা তখন সবখানে যার বাইরে যুদ্ধরত বাংলাদেশও ছিল না। শুরুতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী ভারত যখন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত ও সহায়তা গড়ে তুলতে শুরু করে, তখন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ বর্তমান রাশিয়া ভারতকে সব রকম সহায়তা প্রদান করে। সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের অবস্থানের পক্ষে আরো বলেন:

> কারণ রাশিয়া আমাদের বন্ধুপ্রতীম দেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা যখন সেভেন্থ ফ্লিট পাঠায় পাকিস্তানের পক্ষে, রাশিয়া তখন আমাদের পাশে দাঁড়ায়। কাজেই যারা দুঃসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই তাদের পাশে থাকবো। কিন্তু তারা যদি কোন অন্যায় করে, সেটা আমরা মানবো না। আর আমরা যুদ্ধ চাই না। কিন্তু যুদ্ধটা বাঁধালো কারা, উস্কানিটা কারা দিলো, সেটাও তো আপনাদের দেখতে হবে। সেজন্য আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু এটা শুধু একটা দেশের পক্ষে, আমরা ভোট দেবো না।[১৪]

তিনি অবস্থান পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করে বলেন: "দ্বিতীয় প্রস্তাবটি যখন আসলো, ইউক্রেনে এই যুদ্ধের কারণে মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে, রিফিউজি হয়ে যাচ্ছে, ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই কষ্ট পাচ্ছে, সেখানে মানবাধিকারের বিষয়টা ছিল। ইউক্রেনের দ্বিতীয় প্রস্তাবে যেহেতু মানবাধিকারের প্রশ্নটা, সেইখানে বাংলাদেশ ভোট দিয়েছে।"[১৫] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ইস্যুতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ন্যায় নিজেকে কোন পক্ষভুক্ত না করার বিষয়টি অতি মাত্রায় স্পষ্ট। একই সাথে বিপদে যে বাংলাদেশের পাশে থাকবে তাকে ভুলে না যাওয়ার বিষয়টি তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা প্রচ্ছন্নভাবে এই বার্তা দিচ্ছে যে অনাগত সময়ে যারা বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে তাদের সাথেই বন্ধুত্ব রাখবে বাংলাদেশ।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ট মিত্র ভারত ও জাপান, দেশ দুটি কোয়াড ও ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের (আইপিইএফ) সদস্য এবং বাংলাদেশের জন্য বহু কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই কোয়াড ও আইপিইএফ, যেখানে কোয়াড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামরিক জোট এবং আইপিইএফ মার্কিন নেতৃত্বাধীন ১৪টি দেশের একটি বাণিজ্যক জোট। স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের নিয়ে এই দুই জোটের সদস্য হতে বাংলাদেশর উপর প্রবল কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবে। জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের উদ্যোগে ২০০৭ সালে কোয়াডের সূচনা হলে এক দশক পর ২০১৭ সালে তা সক্রিয় হয়ে উঠে। ন্যাটোর এশিয়া অঞ্চলের সংস্করণ এই কোয়াড নামক সামরিক জোট, যার সম্প্রসারণ এশিয়ায় চীনের সাথে অন্য কোন দেশের চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মত একটি বিপদজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করবে। কোয়াডে অংশগ্রহণ করা থেকে বাংলাদেশকে বিরত থাকতে ২০২১ সালের মে মাসের ১০ তারিখ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হবে বলে এক প্রকার হুশিয়ারি দিয়েছিলেন চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং। "Obviously it will not be a good idea for Bangladesh to participate in this small club of four (QUAD) because it will substantially damage our bilateral relationship."[১৬] চীন এই জোটকে পুরোপুরি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক জোট হিসেবে মনে করে বলেই চীনা রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে সর্তক বার্তা দিয়েছেন। কোয়াডে যোগদান বিষয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পরদিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন:

> আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আমরা নির্ধারণ করবো। যে কোন দেশ তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে। আমরা সেগুলো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু আমরা কি করবো বা করবো না - সেটা আমাদের দেশের জনগণের মঙ্গলের জন্যে, আমাদের নীতিগত অবস্থানের প্রেক্ষিতে উই উইল ডিসাইড (আমরা ঠিক করবো)।[১৭]

তিনি আরো বলেন: "যে প্রতিষ্ঠানের (কোয়াড) কথা বলেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের লোকজন আমাদের কাছে এখনও অ্যাপ্রোচই করে নাই। এটা একটু আগ বাড়িয়ে বলাবলি হয়েছে।" পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে কোয়াডে যোগদান বিষয়ে এখনো পর্যন্ত যে বাংলাদেশের উপর কোন চাপ আসেনি তা সুস্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য থেকে বাংলাদেশ তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিবে না সেই সাথে কোয়াডে যোগদানে বাংলাদেশের অনাগ্রহী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব হ্রাস করতে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এশিয়া নীতির অংশ হচ্ছে এই ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক। ২০২১ সালে প্রথম যখন এই অর্থনৈতিক বলয়ের উদ্যোগটি নেয়া হয়েছিল তখন বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত রাখলেও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব অর্থনীতির ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রনকারী ১৪টি দেশ

নিয়ে গঠিত এই বাণিজ্য জোট থেকে বাদ পড়ে বাংলাদেশ। মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী গিমা রাইমন্ডো এই বাণিজ্য জোটের গুরুত্ব প্রকাশ করতে বলেন:

> IPEF is at the center of Biden Administration's Indo-Pacific strategy. And it reflects the President's commitment to putting workers at the center of our economic and foreign policy while strengthening ties with our allies and partners.[১৮]

এই প্রকল্পটি যে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের বেল্ট অ্যান্ট রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) এর বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে তা খুব সহজেই অনুধাবনযোগ্য। চীন মার্কিন এই বাণিজ্য জোটের বিষয়ে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। চলতি বছরের মে মাসে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের ৭৮তম সম্মেলন চলাকালে আইপিইএফ-এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন: "The Asia- Pacific has once again come to a crossroads of history, [We] unequivocally reject any attempt to introduce military blocs and bloc confrontation into the Asia-Pacific region".[১৯] একই দিনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাথে সংবাদ সম্মেলনে তিনি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন এই কৌশলকে মূল্যায়ন করেন এইভাবে:

> Keen on creating various sorts of small cliques by ganging up on others under the banner of 'freedom and openness'. The strategy aims to contain China and attempts to make Asia-Pacific countries 'pawns' of the U.S. hegemony.[২০]

২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৫টি লক্ষ্য সংবলিত 'ইন্দো-প্যাসিফিক রুপরেখা' নামে এক পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫-এর আলোকে প্রণীত এই নীতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি (Economic diplomacy) প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ এই রূপরেখার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকার বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রস্তাবিত কোন নিরাপত্তা জোটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি মার্কিন-চীন আধিপত্যের লড়াইয়ে চলমান ভারসাম্যের নীতিতে অটল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপর ব্যাপক পশ্চিমা চাপ থাকা সত্ত্বেও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশ তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রকাশের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। চীন-মার্কিন বৈরিতা দিনদিন যে জটিল আকার ধারণ করছে তা আগত সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্যের নীতিতে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে বাংলাদেশকে সময়ের সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করবে।

বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে একটি

ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে স্বাধীনতার ৫৩ বছরে ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশ থেকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই ব্যাপক সফলতার পিছনে রয়েছে টানা ১৪ বছরে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রম, সুযোগ্য নেতৃত্ব সেই সাথে কূটনৈতিক দূরদর্শিতা। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১'-এ (Vision 2041) যে উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে কেন্দ্রে রেখেই সাজানো হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নীতিমালা। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরাণিত করতে ও টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ শুরু করেছে তাতে দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি সর্বোচ্চ সংখ্যায় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টের সব ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান ও চীন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ বাংলাদেশের সব থেকে বড় রপ্তানি বাজার, সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয় চীন থেকে, তৈরি পোষাক খাতের পাশাপাশি অনেক শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের (Backward Linkage) জন্য বাংলাদেশ বৃহৎ পরিসরে চীনের উপর নির্ভরশীল, চীন ও জাপান উভয়ই বাংলাদেশের বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশকে তিন দিক থেকে ঘিরে থাকা বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় হতে অদ্যাবধি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। রাশিয়ার সাথে বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ মেগা প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলমান রয়েছে সেই সাথে রাশিয়া ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চরম সংকটপূর্ণ সময়ের বন্ধু। শি-পুতিন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা শুরুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যাশী বাংলাদেশের জন্য আগামী বছরগুলোতে দক্ষ কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনাগত জটিল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য কিছু করণীয় নিম্নরূপ:

প্রথমত, বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ তুলনামূলক ছোট আয়তনের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি ও দুর্নীতির মত অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে আরোও কিছু দিন আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। বর্তমান সময়ের মত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতেই চলতে হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বিশ্ব দরবারে আরো বেশি পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে নিজের ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে নিজেকে অর্থনৈতিক কেন্দ্র (Economic hub) হিসেবে গড়ে তোলতে হবে। বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে নির্মাণাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলে তাদের সম্পৃকত্বতা বৃদ্ধি করতে পারলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী থাকবেন। আলোচিত বহু-প্রান্তিককরণ (Multi-alignment) বিশ্ব কাঠামোতে বর্তমানের ন্যায় বাংলাদেশের ভবিষ্যতেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের সদস্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, গত শতাব্দীর শীতল যুদ্ধ চলকালীন সময়ের মত বাংলাদেশকে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য এক বড় উদাহরণ হতে পারে ভারত। ভারত কোয়াড ও আইপিইএফ-এর সদস্য হয়েও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত সকল ইস্যুতে নিজের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী নিজেকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্লোভাকিয়ার ব্রাতিস্লাভাতে অনুষ্ঠিত গ্লোবসেক ২০২২ ফোরামের এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের রাশিয়ার নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা এবং সরাসরি কোন পক্ষ বেছে না নেওয়া প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এস জয়শঙ্কর বলেছেন: "I am not sitting on the fence just because I don't agree with you. It means I am sitting on my ground."[২১] তিনি আরো বলেন: "Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems."[২২] এ বক্তব্য পৃথিবীব্যাপী বহুল আলোচিত ও এশিয়ায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। মার্কিন-চীন, ভারত-চীন বৈরিতা এবং ভারত-মার্কিন সখ্য সত্ত্বেও ভারত এ বিষয়ে মার্কিন নীতি অনুসরণ করা থেকে সরে এসেছে, যা বাংলাদেশের মত অনেক রাষ্ট্রের জন্য নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান বর্ণনায় যৌক্তিকতা যুক্ত করবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে বৈশ্বিক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর উল্লেখ রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বর্তমান সময়ের মত ভবিষ্যতেও রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানের বিষয়টি বারবার আলোচনায় নিয়ে এসে আন্তর্জাতিক মহলে একটি চাপ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে রাখতে হবে যাতে কোন নিরাপত্তা জোটের অংশ হতে বাংলাদেশের দিকে ধাবিত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের চাপকে প্রশমিত করা যায়। এশিয়া মহাদেশে চীনের ভৌগোলিক অবস্থান ও ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের দরুন মায়ানমার-বাংলাদেশ চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য চীন সব থেকে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সে-কারণে সকল আন্তর্জাতিক চাপকে প্রশমিত করে চীন বিরোধী কোন জোটে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে হবে যে, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ চীনকে পাশে চায়।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই অস্থিরতার মধ্যে ডিডলারাইজেশনের যে নতুন ধারা সল্প পরিসরে শুরু হয়েছে তাতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অংশ গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্রিকস জোটের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য হয়, একই বছরের অক্টোবর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিশর সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়। উরুগুয়ে ব্যাংকটির প্রস্তাবিত সদস্য। উল্লেখ্য যে, ব্রিকস জোটের পাঁচটি দেশের বাইরে সদস্য পদ প্রাপ্ত বাংলাদেশই প্রথম রাষ্ট্র। ব্রিকস রাষ্ট্রসমূহের ডিডলারাইজেশনের প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের মধ্যে জাতীয় মুদ্রায় লেনদেন শুরু করতে যাচ্ছে। এছাড়া ২০১১ সালে জাপান-চীন, ২০১৩ সালে চীন-

ব্রাজিল ডলারবিহীন বাণিজ্যচুক্তি করে, জাপান-ব্রাজিল, সৌদি আরব-চীন, রাশিয়া-চীন ও ভারত-রাশিয়া ইতোমধ্যে বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনের বিষয়ে কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ-ভারত নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রাশিয়ার সাথেও রুবলে লেনদেনের কাজ এগিয়ে রয়েছে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক চীনা মুদ্রা ইউয়ানে হিসাব (Account) খোলার অনুমতি দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃত ইরান ও রাশিয়ার উপর চলমান অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ২০২১ সালে আফগানিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আটকের মত ঘটনাকে মাথায় রেখে বাংলাদেশের উচিত বিভিন্ন দেশের সাথে নিজেদের জাতীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা এবং এ বিষয়ে কার্যকর বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা। ডলার নির্ভরতা হ্রাস করতে পরলে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হবে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশ 'নতুন আঞ্চলিকতাবাদ' (New Regionalism) কাঠমোকে গুরুত্ব দিয়ে চীনের বিআরআই প্রকল্পে নিজেকে পূর্বেই জড়িত করেছে। ভারতের অনীহায় কাজ পিছিয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যু থাকা সত্ত্বেও আমাদের মায়ানমারের সাথে কানেক্টিভিটি বা সংযোগ বাড়াতে হবে, যেন বিআরআই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে ওঠা যায়।

ষষ্ঠত, বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএআইডি, মার্কিন কৃষি বিভাগ ও দেশটির অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র, জলুবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ আরো অনেক সামাজিক সুরক্ষা খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সহায়তা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগে (এফডিআই) যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষদেশ। অপরদিকে চীন আমাদের অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ করে। দেশে বর্তমানে চলমান অনেকগুলো প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম দেশের প্রথম টানেল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' প্রকল্পটিতে বিনিয়োগকারী দেশ চীন। একই সাথে জাপান আমাদের সব থেকে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশ। দেশের প্রথম মেট্রোরেলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে জাপানের সহযোগিতায়। রাশিয়ার সাথে মিলে আমরা দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ করছি। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ভারতের বিনিয়োগ রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এসব বিনিয়োগকারী দেশসমূহকে আরো বেশি সহযোগিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের পাশে ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিশেষে, চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ যতটা দীর্ঘায়িত হবে নতুন স্নায়ুযুদ্ধের আশঙ্কা ততটা নিকটবর্তী হবে। এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির চিত্র দ্রুত পাল্টাচ্ছে। যদি এ যুদ্ধে রাশিয়া তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তাইওয়ানকে নিজের সাথে একীভূত করার চীনের স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফন ঘটতে পারে, যা এ অঞ্চলকে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্লকে ভাগ করে ফেলবে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা মোটেও সুখকর হবে না। কোভিডের ধাক্কা সামলে বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নতুন উদ্যমে কাজ

শুরু করেছে তখনই বৈশ্বিক অর্থনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে। এই নেতিবাচক আঘাত সারিয়ে তুলতে লম্বা সময় লাগবে। আর যদি সহসা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয় তাহলে ইউরোপের অর্থনীতি যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তা পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থনীতিকে বেশ ঝুঁকিতে ফেলে দিবে কারণ ইউরোপ আমাদের তৈরি পোষাক খাতের অন্যতম বড় রপ্তানি বাজার। তাই এখন থেকেই সকল প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যের বহুমুখীকরণকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজে বের করার কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ যতই সময়ের সাথে এগিয়ে চলছে ততই বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ব শক্তির এ ভারসাম্য কখন ও কি রূপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হবে তা এখনো অজানা। পরাশক্তিসমূহের শক্তির ভারসাম্যের সাম্যাবস্থার স্বরূপের উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের বিশ্ব-রাজনীতির গতি প্রকৃতি। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে ব্যাপক কূটনৈতিক দক্ষতা ও সময়োপযোগী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কূটনীতির ধারাকে চলমান রেখে বিপুল বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিক হাব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নিজের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের দাবি শক্তিশালীভাবে তুলে ধরার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার উপর আরোপিত পশ্চিমা কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে পুরো বিশ্বে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি ও বৈশ্বিক জ্বালানি তেলের বাজারে অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাবের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে পরিবহন খরচ বেড়েছে ফলে আমদানিকৃত সার, ভোজ্য-তেল, খাদ্যদ্রবের জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক ডলার খরচ হচ্ছে। বাংলাদেশকে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করতে হয় বিধায় অধিক ডলার খরচ হওয়ায় দেশে ডলার সংকট তৈরি করছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলার নির্ভরতা হ্রাস করতে অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের চীনা মুদ্রা ইউয়ানে হিসাব খোলার অনুমতি প্রধান এবং বাংলাদেশ-ভারত নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়ে মতৈক্যে পৌছানোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে বড় পরিবর্তনের সূচনা শুরু করেছে তা ফলপ্রসূ করতে অধিকহারে ব্যবসায়ীদের যুক্ত করতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শি-পুতিন ঘোষিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় যে বহুমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার আশা করা হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান তৈরি করতে হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের কোন বিকল্প নেই। তা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান পশ্চিমা রপ্তানি বাজার ধরে রেখে রপ্তানির নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভবনাময় রাষ্ট্রসমূহের সাথে

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকল প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের সাথে বিদ্যমান সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী পরাশক্তি চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে পূর্বের ন্যায় 'জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি' অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় দ্রুত পরিবর্তনশীন বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাবে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির পরিবর্তনশীন সমীকরণ এ অঞ্চলকে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্লকে ভাগ করে ফেলার যে পূর্বাভাস দিচ্ছে, তা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে সতর্কতার সাথে যেকোন আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবিলা করে তার জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ কূটনৈতিক সফলতা দেখানোর যে ধারা শুরু করেছে সে ধারাকে ভবিষ্যতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ Ursula von der Leyen presenting the State of the Union: Putin Will fail, and Europe will prevail, *EU NEIGHOURSEAST*, September 14, 2022.

২ James Graham Wilson, *THE TRIUMPH OF IMPROVISATION*, Cornell University Press, New York, 2014, p. 170.

৩ Marc Weller, *Iraq and Kuwait: The Hostilities and their Aftermath*. Cambridge International Documents, vol. 3 (Cambridge: Grotius Publications, 1993), pp. 281-283.

৪ সৈয়দ মাহমুদ আলী, ইউক্রেনে রাশিয়া ও নেটোর ছায়া-যুদ্ধ কি সম্মুখসমরে রুপ নিতে পারে?, *বিবিসি নিউজ বাংলা*, এপ্রিল ৬, ২০২৩।

৫ Robyn Dixon and Lily Kuo, Xi and Putin showcase alliance but offer no path to peace in Ukraine, *The Washington Post*, March 21, 2023.

৬ প্রাগুক্ত

৭ Xi and Putin pledge to shape a new world order as the Chinese leader leaves Russia with no peace in sight for Ukraine, *nbcnews.com*, March 22, 2023.

৮ প্রাগুক্ত

৯ Clifford A. Kiracofe, Xi- Putin Summit and Great Changes of World Order, *China Today*, March 31, 2023.

১০ Jamil Anderlini and Clea Caulcutt, Europe must resist pressure to become 'America's followers,' says Macron, *POLITICO*, April 9, 2023.

১১ Happymon Jacob, A New Delhi View on the World Order, *institutmontaigne.org*, October 06, 2022.

[১২] Mary Ilyushina, Putin and Xi want a new world order, *The Washington Post*, March 23, 2023.

[১৩] ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ: জাতিসংঘের প্রস্তাবে ভোট না দেয়া এবং পরে ইউক্রেনের পক্ষ নেয়ার ব্যাখ্যা দিলেন শেখ হাসিনা, *বিবিসি নিউজ বাংলা*, মার্চ ৩০, ২০২২।

[১৪] প্রাগুক্ত

[১৫] প্রাগুক্ত

[১৬] China warns of 'subtantial damage' to ties if Bangladesh joins US-led Quad alliance; Dhaka calls it 'aggressive', *The Economic Times,* May 11, 2021.

[১৭] কোয়াড নিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের জবাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন, *বিবিসি নিউজ বাংলা*, মে ১১, ২০২১।

[১৮] Gina M. Raimondo, Remarks by U. S. Secretary of Commerce Gina Raimondo at the Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Breakfast, *U. S. Department of Commerce*, September 8, 2022.

[১৯] Choi Hyun-june, China slams IPEF as coercing Asian countries to choose between china, US, *HANKYOREH*, May 24, 2022.

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] Poulomi Ghosh, 'No, India not sitting on fence': Jaishankar says Europe has to change mindset, *Hindustan Times*, June 3, 2022.

[২২] প্রাগুক্ত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

তানভীর আহমেদ*

সারসংক্ষেপ

সমকালীন নীতিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রাণনীতিবিদ্যা (bioethics)। প্রাণনীতিবিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান হতে নৈতিকতার দিকে একটি অগ্রযাত্রা। এই প্রাণনীতিবিদ্যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রাণনীতিবিদ্যার ইস্যুগুলোতে সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনার বাহিরে রেখে কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে এনে এটিকে আলোচনা অসম্ভব। সংস্কৃতি আদতে স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি এক দেশের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের সংস্কৃতির মূল্যায়ন বা তুলনা করা চলে না। অর্থাৎ সংস্কৃতির কোনো সার্বজনীন মানদণ্ড নেই। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে প্রাণনীতিবিদ্যার কোনো সার্বজনীন রূপরেখা প্রণয়ন করাও সম্ভব নয়। যদিও প্রাণনীতিবিদ্যার কোনো সার্বজনীন রূপরেখা নেই, কিন্তু প্রাণনীতিবিদ্যায় উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ কিন্তু সার্বজনীন। অর্থাৎ প্রাণনীতিবিদ্যায় বিদ্যমান যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় তা পৃথিবীর সব সমাজে এক। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে এই সমস্যার সমাধান সব সমাজে অভিন্ন হবে না। বাংলাদেশের মত সমাজ ব্যবস্থায়ও এই ব্যাপারটি ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ একটি বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্র এবং এই সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেই বাংলাদেশে প্রাণনীতিবিদ্যার অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার আলোকে প্রণীত প্রাণনীতিবিদ্যার মানদণ্ডসমূহ থেকে আলাদা করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণনীতিবিদ্যাকে বিবেচনা করতে হবে, যাতে এটি বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ না হয়। উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে, প্রাণনীতিবিদ্যার সাথে সংস্কৃতি কিভাবে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তার কিছু কাঠামোগত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: প্রাণনীতিবিদ্যা, সংস্কৃতি, স্ব-শাসন, বাংলাদেশ।

১. ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সর্বাধিক অবদান সাধিত হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনে। জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে আমাদের জীবন যাপন যেমন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও অগ্রগামী হয়েছে, সেইসাথে বিজ্ঞানের কিছু নেতিবাচক আবিষ্কারের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আমাদের উপর পড়েছে এবং আমাদের সম্মুখীন করেছে কিছু নৈতিক প্রশ্নের। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাণনীতিবিদ্যার (bioethics) উদ্ভব ঘটেছে। প্রাণনীতিবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে জীববিজ্ঞানের অবদানসমূহ যাতে করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী এবং পরিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। পাশাপাশি, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাণনীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে ঔষধ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্যসংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং এর সাথে গুরুত্ব

* প্রভাষক, জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব), ঢাকা

পেয়েছে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার (medical ethics) আলোচ্য বিষয়সমূহ। এই প্রাণনীতিবিদ্যা কিছু সুসংবদ্ধ নৈতিক মানদণ্ড নির্মাণ করে দেয় যে কিভাবে আমরা এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করবো। ১৯৬০ এর দশক থেকে স্বাস্থ্যসেবা এবং জৈবচিকিৎসা বিজ্ঞানের (biomedical science) ক্ষেত্রে নৈতিক সমস্যাগুলো অভূতপূর্ব উপায়ে জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় জৈবচিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিন একটি বৈপ্লবিক ধারা তৈরি করে। ডায়ালাইসিস মেশিন, কৃত্রিম ভেন্টিলেটর এবং অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মত বৈপ্লবিক চিকিৎসা বিপ্লব মানুষের জীবনকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে নতুন করে বাঁচার সম্ভাবনা দেখায়। পাশাপাশি গর্ভপাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে, কিন্তু একই সাথে একটি বড় নৈতিক সংকট তৈরি করে যে গর্ভপাত কি নৈতিকভাবে বৈধ নাকি অবৈধ? চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জৈবপ্রযুক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিবেশের নানা ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি প্রসার লাভ করে আসছে। সেই সাথে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে অ-মানব প্রাণীর উপরে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন কোনো ঔষধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং গবেষণাগারে অ-মানব প্রাণী ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রায়াল হিসেবে। গবেষণায় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তথা প্রোটিনের উৎস হিসেবে অ-মানব প্রাণী ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনা করাও প্রাণনীতিবিদ্যার প্রয়াস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রাণনীতিবিদ্যার তত্ত্ব বা মূলনীতিসমূহ কি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কোনো পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা? অর্থাৎ প্রাণনীতিবিদ্যার কোনো সার্বিক মানদণ্ড রয়েছে কি? এখন আমরা যদি প্রাণনীতিবিদ্যার একটি মানদণ্ড তৈরি করতে চাই তাহলে দেখবো যে এটির সাথে প্রথমত যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জড়িত তা হচ্ছে সংস্কৃতি। একটি নির্দিষ্ট দেশে বা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং ঐ সমাজে বসবাসকারী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, মানসিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। সেক্ষেত্রে ঐ সমাজে প্রাণনীতিবিদ্যার একটি নৈতিক মানদণ্ড তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে এসব সাংস্কৃতিক চিন্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতিকে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সেজন্য প্রাণনীতিবিদ্যাকে আমরা কখনও সার্বিক বলতে পারি না। আবার যেহেতু নৈতিকতা সংস্কৃতি এবং ধর্ম উভয়ের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ, তাই প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো নির্মাণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্থান দিতে হবে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কো (UNESCO)[১]- এর Universal Declaration on Bioethics and Human Rights শীর্ষক সাধারণ সম্মেলনের ১২তম অনুচ্ছেদে, যা প্রাণনীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির গুরুত্বের ভূমিকাকে তুলে ধরে। ১২তম অনুচ্ছেদে *Respect for cultural diversity and pluralism* শিরোনামে বলা হয়েছে:

> The importance of cultural diversity and pluralism should be given due regard. However, such considerations are not to be invoked to infringe upon human dignity, human rights and fundamental freedoms, nor upon the principles set out in this Declaration, nor to limit their scope.[২]

অর্থাৎ প্রাণনীতিবিদ্যার আলোচনায় সংস্কৃতিবাদ এবং বহুত্ববাদের গুরুত্বকে স্থান দিতে হবে। এমনকি এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অগ্রাধিকারের পাশাপাশি সার্বজনীন ঐক্যমতের দাবির সাথে এটির ভারসাম্য বজায় রাখার অসুবিধাকেও তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এমনভাবে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান'– এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা প্রাণনীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে এবং একই সাথে প্রাণনীতিবিদ্যার আন্তর্জাতিক মানের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটি থেকেও অভিন্ন হবে না।

একটি সমাজের সংস্কৃতি ঐ সমাজের প্রাণনীতিবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, আবার বিরোধপূর্ণও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি দেশের প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো হতে হবে ঐ দেশের সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। আবার সমাজবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট হল তাঁর সাংস্কৃতিক তত্ত্বে (cultural theory) বলেন– একটি সমাজের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ঐ সমাজের মানুষের সম্মতি (consent) ও প্রতিরোধ (resistance)- এ দুইয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।[৩] অর্থাৎ সমাজে নতুন একটি অনুশীলন (practice) বা বিধানকে তখনই সম্মতি দেওয়া হয় যখন সেটি ঐ সমাজে বিদ্যমান সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আবার বিদ্যমান সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হলে জনগণ সেই মতের বিপক্ষে প্রতিরোধ তৈরি করে। এই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন একটি সংস্কৃতি সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৪] বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা অনুরূপ। বাংলাদেশে প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলীকে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ বাংলাদেশের প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো যদি দেশের বসবাসকারী মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আচার, কৃষ্টি প্রভৃতির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি ব্যক্তি তথা প্রাণীর স্ব-শাসনকে (autonomy) লঙ্ঘন করবে এবং ফলে সাধারণ জনগণের নিকট সেটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তাই নীতিদার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় রাখতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যাকে আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত প্রাণনীতিবিদ্যার বিভিন্ন ইস্যুসমূহ সংস্কৃতির সাথে বিরোধপূর্ণ নাকি সমর্থনযোগ্য সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে এবং সংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় রেখে কিভাবে প্রাণনীতিবিদ্যার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে।

২. প্রাণনীতিবিদ্যা কী?

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যার আলোচনার পূর্বে প্রাণনীতিবিদ্যা প্রসঙ্গটির ধারণা সুস্পষ্ট করা যাক। ইংরেজি *Bioethics* শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে প্রাণনীতিবিদ্যা শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।[৫] *Bioethics* শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ *bios* এবং *ethos* দ্বারা গঠিত। গ্রিক শব্দ *bios* এর বাংলা পারিভাষিক অর্থ হলো জীবন বা প্রাণ এবং *ethos* শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো

মূল্য। পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে প্রাণনীতিবিদ্যা হলো জীবন সম্পর্কিত মূল্যায়ন। একই সাথে প্রাণনীতিবিদ্যা প্রাণিবিজ্ঞান ও জৈব-প্রযুক্তির অবদানসমূহের নৈতিক মূল্যবিচারের প্রয়াস চালায়। প্রাণনীতিবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভ্যান রেনসেলিয়ার পটারের সংজ্ঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬] পটারের ভাষায় প্রাণনীতিবিদ্যা হলো বিজ্ঞান থেকে নৈতিকতার দিকে গুরুত্বপূর্ণ অভিযাত্রা। পটার প্রাণনীতিবিদ্যাকে জীবতত্ত্ব (life science), বিশেষ করে জীববিজ্ঞান (biology) এবং মানবিক বিজ্ঞান (humanities), বিশেষ করে নীতিশাস্ত্রের (ethics)– এর সমন্বয় করে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[৭] অর্থাৎ পটার দাবি করছেন যে নীতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন নতুন করে জীববিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞানের আলোকে হওয়া দরকার এবং একই সাথে জীববিদ্যা বিষয়ক গবেষণার সাধনাকে মানবিক জ্ঞানের সাথে সমন্বিত করাও জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ইস্যু প্রাণনীতিবিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানকার অবদানসমূহ যেন লাগামহীন না হয়, ভোক্তা ও এর লক্ষিত-উপাদানসমূহ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানই এর লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পটার প্রাণনীতিবিদ্যা বলতে বুঝিয়েছেন জীবনের সকল ধারা ও স্বরূপ সম্পর্কিত মূল্যবোধকে। এখন দাবি উঠতে পারে যে জীবনের মাত্রাকে আমরা কিভাবে নির্ধারণ করবো? অথবা জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনের মূল্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? এসব দিক বিবেচনায় আনলে পটারের সংজ্ঞাকে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।[৮]

এছাড়া ইউনেস্কো প্রাণনীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় জীবনের বৃহত্তর পরিসর ও এর বহুমাত্রিক দিকটি বিবেচনা করেছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশগত, চিকিৎসা এবং ক্লিনিক্যাল সমস্যাসমূহ। ইতঃপূর্বে শিক্ষার সকল স্তরে প্রাণনীতিবিদ্যার শিক্ষাকে সব দেশের নাগরিকের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ইউনেস্কো। ১৯৯৭ সালের সাধারণ কনফারেন্সে ইউনেস্কো Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights এর মাধ্যমে এই ঘোষণা দেয় এবং ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন উক্ত ঘোষণাটি অনুমোদন করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহুমুখী সংকট সমাধানের প্রয়োজনে ইউনেস্কো এর পাঁচটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মের মধ্যে নীতিশিক্ষাকে একটি অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই কর্মপন্থার অংশ হিসেবে Universal Declaration on Bioethics and Human Rights অনুমোদন করে সংস্থাটির ৩৩ তম কনফারেন্সে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত ঘোষণার সম্মতি জানিয়েছে।[৯] এ কারণেই বাংলাদেশে বিদ্যমান জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবাধ ব্যবহারকে নীতিসম্মত করা এবং এ সম্পর্কিত বিতর্কের একটি নীতিবিদ্যাসম্মত জবাব অনুসন্ধান করার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি এ সম্পর্কিত একাডেমিক পঠন-পাঠনের প্রয়োজনও অনুধাবন করা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রাণনীতিবিদ্যা কেন? এর একটি সুস্পষ্ট জবাব হতে পারে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী অধিকার প্রতিষ্ঠা, কৃষিক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে বহু মানুষের বহুবিধ

মতামত থাকতে পারে। এই মতামতগুলোকে সংবিধিবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে আনার একটি প্রয়াস হচ্ছে প্রাণনীতিবিদ্যা। এই প্রাণনীতিবিদ্যার সাথে যেহেতু সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত, সেজন্য সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

৩. সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যা

যদি প্রশ্ন করা হয় সংস্কৃতি কী? তাহলে আমরা সংস্কৃতিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমত, সংস্কৃতি হচ্ছে প্রকৃতি চর্চার কার্যকলাপ যেটি মূলত এটির কাঁচামাল হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃতি দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতাসমূহকে অতিক্রম করার জন্য মানব সমাজকে এই কার্যকলাপটি চর্চা করতে হয়। আমরা যখন কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তির কথা বলি সে মূলত এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে এলেইন লকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, "সবচেয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন দায়িত্ব হচ্ছে সংস্কৃতিবান হবার দায়িত্ব"।[১০] লকের এই বক্তব্যকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের প্রকাশভঙ্গির সর্বাধিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক রূপগুলোকে বোঝার এবং সেই সাথে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা।[১১] যে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি তার নিজের সমাজের সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ করে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে একজন পরিশোধিত ব্যক্তি। এই ধারণা আমাদেরকে সভ্য হবার ধারণার দিকে নিয়ে যায়। একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রই সভ্য (civilized) ব্যক্তি।

অন্যদিকে সংস্কৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর। টেইলরের মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে মূল্যবোধ, রীতিনীতি, বিশ্বাস এবং অনুশীলনের জটিল সংমিশ্রণ যা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রাকে গঠন করে। এবং এই জটিল সংমিশ্রণের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ দ্বারা অর্জিত অন্য কোনো ক্ষমতা এবং অভ্যাস"।[১২] টেইলর সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে যে বিশ্বাসের কথা বলেছে এই বিশ্বাস মূলত ব্যক্তির সমাজের প্রথাগত বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, এমনকি ব্যক্তিগত বিশ্বাসও হতে পারে। অনেকেই ধারণা করে থাকে যে ধর্ম এবং সংস্কৃতি আলাদা বিষয়, আদতে ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি উপাদান। সে-হিসেবে ধর্মকে সংস্কৃতির বাইরে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

এবার আমরা সংস্কৃতির সংজ্ঞায় জার্মান দার্শনিক জোহান গটফ্রিড হার্ডারের মতামতটি বিবেচনা করতে পারি। হার্ডার সংস্কৃতির সংজ্ঞার সার্বজনীনতার প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়েছেন। হার্ডার দাবি করেন, সংস্কৃতির একটি সার্বজনীন ভিত্তি রয়েছে সেটি বলা যাবে না। বরং দেশ ও জাতিভেদে এটির স্বরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং প্রতিটি সংস্কৃতির বিবর্তনের একটি নিজস্ব আইন রয়েছে।[১৩] হার্ডার-এর মতে সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাচীন, জৈবিক এবং নির্ভেজাল। সংস্কৃতির এই ধারণাটি পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের মানুষের সংস্কৃতিকে সমানভাবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ আমরা কখনো এটি দাবি করতে

পারি না যে , এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সংস্কৃতির তুলনায় উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট। এমনকি একটি সমাজের সংস্কৃতি নৈতিক বিবেচনায় ভালো নাকি মন্দ সেটাও দাবি করা যায় না। অর্থাৎ সংস্কৃতির শ্রেণিবিন্যাসও ভিত্তিহীন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে টেইলর এবং হার্ডার সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা এবং উপাদানের কথা বলেছেন সেই দিক বিবেচনা করলে সংস্কৃতির কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি স্থান কাল ভেদে ভিন্ন রূপ নেয়। সেইসাথে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের সংস্কৃতি নির্মিত হয় ঐ দেশে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, প্রথা, আইন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যার আলোচনায় মুখ্য যুক্তি হচ্ছে– সংস্কৃতি যেহেতু প্রাণনীতিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সংস্কৃতি স্থান কাল ভেদে ভিন্ন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমাজে প্রাণনীতিবিদ্যার ভিত্তি হতে হবে স্বতন্ত্র এবং প্রাণনীতিবিদ্যার মানদণ্ডসমূহকে নির্মাণ করতে হবে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় রেখে।

যদিও প্রাণনীতিবিদ্যার কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রাণনীতিবিদ্যায় উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ কিন্তু সার্বজনীন। অর্থাৎ প্রাণনীতিবিদ্যার যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় সেইসব সমস্যা পৃথিবীর সব সমাজে এক। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান সব সমাজে এক হবে না সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে। তবে সব দেশের প্রাণনীতিবিদ্যা তিনটি ভিত্তি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়।[১৪] এগুলো হলো:

১. নীতির স্তর (the level of principle): এ স্তরে রয়েছে স্ব-শাসন (autonomy), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) এবং ধর্মনিরপেক্ষতার (secularism) মত বিষয়, যেগুলোকে প্রাণনীতিবিদ্যার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. নিয়মের স্তর (the level of rules): এখানে কোনো পদ্ধতি বা বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন জেহোবা সম্প্রদায়ের (jehovah's witnesses) নিকট ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গিয়ে চিকিৎসা করে বেঁচে থাকার চেয়ে স্বর্গীয় মৃত্যুকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।[১৫]

৩. অনুশীলনের স্তর (the level of practice): এই স্তরে সমাজের ব্যবহারিক সমস্যাগুলোকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস দেখা যায়। যেমন: চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসা সরঞ্জামের সুষ্ঠু বণ্টন প্রভৃতি সমস্যাগুলোকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে এনে সমাধান করার চেষ্টা করা।

এই তিনটি স্তরের সমন্বয়ে সব সমাজের প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো তৈরি হয়। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং প্রাণনীতিবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি কেমন সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা রাখা জরুরী।

৪. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রাণনীতিবিদ্যার অবস্থান

বাংলাদেশের প্রাণনীতিবিদ্যা একই সাথে জীববিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ ধর্মীয় ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, সাংস্কৃতিক জ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, নীতিদার্শনিক জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের অবদানসমূহকে সমন্বিত করে এর বিকাশ ঘটেছে। একই সাথে এর প্রয়োগও হয়েছে বহুমুখী ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের প্রাণনীতিবিদ্যার প্রেক্ষাপটে যে সকল বিষয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা নীতিবিদ্যা, জৈবপ্রযুক্তি তথা প্রাণী অধিকার দর্শন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইস্যুসমূহ হচ্ছে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক (doctor-patient relationship), অঙ্গ-প্রতিস্থাপন (organ transplantation), গর্ভপাত (abortion), স্বস্তিমৃত্যু (euthanasia) ও নতুন প্রজনন প্রযুক্তি (stem-cell research) প্রভৃতি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রতিটি ইস্যুর সাথে সাংস্কৃতিক বিষয় জড়িত। তবে উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে প্রাণনীতিবিদ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে গর্ভপাত, অঙ্গ-প্রতিস্থাপন, চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক এবং সেই সাথে জৈবপ্রযুক্তির মত বিষয়ের সাথে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কীভাবে জড়িত সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় যেহেতু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয়টি বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে সেহেতু উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আলোকে প্রাণনীতিবিদ্যাকে আলোচনা করা হবে।

৪.১ সংস্কৃতি ও চিকিৎসা নীতিবিদ্যা

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে সর্বাধিক হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বী, দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়, এছাড়া রয়েছে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস। যেহেতু বাংলাদেশ বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির রাষ্ট্র, সেক্ষেত্রে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার আলোচনায় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোও আলোচনার দাবি রাখে।

চিকিৎসা নীতিবিদ্যার জন্য কতগুলো নৈতিক নীতি রয়েছে যেগুলোকে ইথিক্যাল টুলস (ethical tools) বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের চিকিৎসা নীতিবিদ্যায়ও এই ধরনের চিকিৎসা নীতিগুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। আশির দশকের দিকে টম বিচাম এবং জেমস চিল্ড্রেস তাঁদের রচিত *Principles of Biomedical Ethics* গ্রন্থে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কতগুলো নৈতিক নীতির সমন্বয়ে

ইথিক্যাল টুলসের প্রস্তাব করেন। চারটি নৈতিক নীতির সমন্বয়ে গঠিত এই পদ্ধতি নীতিবাদ (principlism) হিসেবে পরিচিত।[১৬] এই নীতিবাদের চারটি মূলনীতি লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে: ১. স্ব-শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা নীতি (the principle of respect for autonomy), ২. ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি (the principle of non-maleficence), ৩. পরহিতসাধনের নীতি (the principle of beneficence), ৪. ন্যায়পরতার নীতি (the principle of justice)।

প্রথম নীতিতে স্ব-শাসনের ধারণাটি আরোও সুস্পষ্ট করতে গেলে আমরা দেখবো এটি ইংরেজি *Autonomy* শব্দের পরিভাষা যা দুটি গ্রিক শব্দ *autos* এবং *nomos* থেকে উদ্ভূত। *autos* শব্দের অর্থ নিজস্ব এবং *nomos* শব্দের অর্থ নিয়ম, আইন বা শাসন। বুৎপত্তিগত অর্থে স্ব-শাসনকে নিজস্ব আইন, নিজস্ব সরকার, নিজস্ব শাসন, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। প্রাচীন স্বাধীন হেলেনিক নগর রাষ্ট্রগুলোতে নিজস্ব আইন এবং নিজস্ব সরকার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসন শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৭] স্ব-শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা নীতিটির মূল বক্তব্য হচ্ছে– বুদ্ধিমান প্রাণীর ঐচ্ছিক প্রেষণা বা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রয়েছে। অথবা, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যরা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অবশ্যই ব্যক্তিকে অবগত করতে হবে। পাশাপাশি বিবেচনায় রাখতে হবে সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে কি-না। স্ব-শাসন শব্দটি আত্ম পরিচালনা, স্বাধীনতা, অধিকার, গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত পছন্দ, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপকতর অর্থে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং, সাধারণ ইংরেজি অভিধানে বা সমসাময়িক দর্শনে স্ব-শাসন কোনো স্বতন্ত্র ধারণা নয়। বেশ কয়েকটি ধারণার সমন্বয়ে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে স্ব-শাসনের ধারণাটি গঠিত। ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্রের সাম্প্রতিক আলোচনায় এবং বিশেষ করে প্রাণনীতিবিদ্যায় স্ব-শাসনের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় নীতিটি হলো ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি। এ নীতি অনুসারে কোনো রোগীকে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা স্বেচ্ছায় অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা প্রদান করা যাবে না। যে পদক্ষেপগুলো রোগীর ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন শর্তগুলি অপসারণ করতে হবে। এই নীতিটির ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে চিকিৎসাক্ষেত্রে যা রোগীর জন্য উপযুক্ত সেগুলো গ্রহণ করা এবং যেগুলো অনুপযুক্ত সেগুলো বর্জন করা। আবার কোনো চিকিৎসক যদি রোগীর প্রতি অযত্ন করে কিংবা অযৌক্তিক কোনো ঝুঁকি নেওয়ার কারণে যদি রোগীর কোনো ক্ষতি হয় তবে সেটা হবে অবহেলার সমতুল্য।

তৃতীয় নীতিটি হলো পরহিতসাধনের নীতি। এই নীতির প্রচলিত অর্থ হলো– স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা চিকিৎসককে অবশ্যই রোগীর মঙ্গল ও কল্যাণকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমনকি রোগীর রোগ উপশমের জন্য যা করণীয় সেটাকে আগে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ নীতিটি কেবল ক্ষতি এড়াতে নয়, বরং রোগীদের উপকার জন্যও আহ্বান জানায়। যে কোনো রোগীর সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক ঔষধ কিংবা প্রতিষেধক আবিষ্কার করাও এই নীতির আওতাভুক্ত।

চতুর্থ নীতিটি হলো ন্যায়পরতার নীতি। এই নীতিটি বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের 'giving to each that which is his due' নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।[১৮] এই নীতিটি দাবি করে যে সব সমাজে যে কোনো চিকিৎসাসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বণ্টন নীতি থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি ভোক্তার যথার্থ স্বত্বাধিকার রয়েছে কি-না সেটিও বিবেচনা করতে হবে। চিকিৎসাক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করাও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত চারটি নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমরা যে নীতিসমূহ ব্যবহার করবো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগীর স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা। এই স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার সাথেই হচ্ছে সংস্কৃতি জড়িত। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় আনা হলে অর্থাৎ রোগীর প্রথাগত বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক অনুশীলন, প্রথাগত নিয়ম-কানুন প্রভৃতি যদি বিবেচনায় রেখে ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে তাহলেই ডাক্তার এবং রোগীর পারস্পরিক স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। এবং পাশাপাশি ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় গর্ভপাত, অঙ্গ-প্রতিস্থাপন, চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক– এই বিষয়গুলোতে বাংলাদেশের মানুষের যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জড়িত এবং সেগুলো কীভাবে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার সম্ভাব্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে সেটি আলোচনা করা যাক।

৪.১.১ গর্ভপাত

চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে গর্ভপাত (abortion)। গর্ভপাত কি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নাকি অগ্রহণযোগ্য সেই বিতর্ক চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় বহুদিন চলে আসছে। গর্ভবতী মায়ের জরায়ু হতে অপরিণত ভ্রূণ (fetus) বের করাকে গর্ভপাত বলা হয়। এই গর্ভপাত স্বঃপ্রণোদিত হতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। গর্ভপাত কৃত্রিমভাবে করা যায় আবার গর্ভকালীন জটিলতার কারণেও প্রাকৃতিকভাবে গর্ভপাত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে যে গর্ভপাত ঘটে তাতে কারো হস্তক্ষেপ থাকে না বিধায় সে বিষয় কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। কিন্তু কোনো গর্ভবতী নারী যদি স্বঃপ্রনোদিত হয়ে নিজের গর্ভপাত ঘটান তাহলেই শুরু হয়ে যায় তুমুল বিতর্ক। এক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় অনেক ধরনের নৈতিক প্রশ্নের।

বর্তমান সময়ে গর্ভপাত বাংলাদেশের বেশ আলোচিত একটি একটি ইস্যু। সর্বশেষ জরিপ (২০১৪) বলছে, দেশে বছরে ১১ লাখ ৯৪ হাজার স্বপ্রণোদিত গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, দৈনিক গড়ে এ ধরনের গর্ভপাতের সংখ্যা ৩ হাজার ২৭১টি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Guttmacher Institute ২০১৪ সালে এই জরিপ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এবং বিশ্বের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে জনসংখ্যা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যের মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকে। বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Association for Prevention of Septic Abortion, Bangladesh (BAPSA) ২০১৪ সালে এই

জরিপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রতি ১ হাজার নারীর মধ্যে ২৯ জন স্বপ্রণোদিত গর্ভপাত করান।[১৯]

যদিও বাংলাদেশ আইনগতভাবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ, তবে গর্ভবতী মা এবং নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি থাকলে সেক্ষেত্রে গর্ভপাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এছাড়া গর্ভপাতের সাথে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি কিভাবে জড়িত এ বিষয়গুলো বিবেচনা না করে গর্ভপাত করলে গর্ভপাত কখনো নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। বাংলাদেশে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি বিশেষভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে মূলত ধর্মীয় সংস্কৃতি।

শুরুতেই আসা যাক গর্ভপাত নিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতবাদে। গর্ভপাতের বিষয়ে ইসলামে সরাসরি কিছু বলা নেই। তবে কিছু নির্দেশনা আছে যেগুলো গর্ভপাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে ইসলামিক চিন্তাবিদরা মনে করেন। ইসলামে জীবনকে সব সময় পবিত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। মায়ের গর্ভ থেকে আরম্ভ করে পরিপূর্ণ শিশুর জন্ম নেওয়া একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে একটি ভ্রূণ এবং একটি মানুষের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। উদ্ভিদের বীজের মধ্যে যেমন একটি সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে যে একদিন সে একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে, তেমনি মানব ভ্রূণের মধ্যেও সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে একটি পরিপূর্ণ মানুষের সত্তা। অ্যারিস্টটল যেমনটি বলেছিলেন সুপ্ত অবস্থা (potentiality) থেকে পরিণত অবস্থায় (actuality) পৌঁছানো। আবার প্রাণ হত্যা প্রসঙ্গে *আল-কোরআন*-এ বলা হয়েছে:

> কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার শাস্তি বিধান ছাড়া অন্য কোনো কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আবার এমনিভাবে যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল। (*আল-কোরআন*, আল-মায়েদা ৫: ৩২)

মানব ভ্রূণ এবং মানব শিশুর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এই মানব ভ্রূণের পরিণতিই হলো মানব শিশু। এক্ষেত্রে একটি ভ্রূণ এবং মানব শিশু সমান মর্যাদা পাবে। তাই উপরোক্ত কোরআনের বিবৃতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভ্রূণ হত্যা এবং মানবহত্যা সমতুল্য। সুতরাং সে বিবেচনায় গর্ভপাত ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

আবার, সমাজে অনেক দরিদ্র পরিবার থাকতে পারে যারা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ফলে সন্তানের ভরণপোষণ বহন করতে আপোষ করে থাকে। সেক্ষেত্রে তারা গর্ভপাত করাকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু, কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন আগত শিশুকে লালনপালন করা তার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে না এবং দরিদ্রতার ভয়ে যদি সে ভ্রূণ হত্যা করে, তাহলে সেটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। *কোরআন*- এ বলা হয়েছে:

> তোমরা তোমাদের সন্তানকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিজিক দান করি। তাই তাদের হত্যা করা সত্যিকার অর্থেই একটি মহাপাপ। (*আল-কোরআন*, বনী ইসরাঈল ১৭: ৩১)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দরিদ্রতার কারণেও ইসলামে কখনো গর্ভপাত সমর্থনযোগ্য নয়। তবে গর্ভবতী নারীর জীবন যদি হুমকির মুখে পড়ে সেক্ষেত্রে ইসলামের ভিন্ন মত রয়েছে। যেমন গর্ভবতী হবার কারণে যদি কোনো নারীর ক্যান্সার বা এমন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি হবার সম্ভাবনা থাকে অথবা সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মৃত্যুঝুঁকি থাকে এবং বিষয়টি যদি নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের বয়স চার মাস হওয়ার আগে গর্ভপাত ঘটানো ইসলাম মতে বৈধ।[২০] অতএব আমরা বলতে পারি যে চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় গর্ভপাত প্রসঙ্গে ইসলামিক রীতিনীতি বা ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে যেটি বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য বিষয়।

এবার আসা যাক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে। সনাতন ধর্মমতে গর্ভপাত সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি প্রচলিত রয়েছে যেগুলো হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। সনাতন শাস্ত্রে গর্ভপাতকে কখনোই সমর্থন করা হয় না। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী গর্ভপাতের মাধ্যমে ভ্রূণ হত্যা করা একজন পুরোহিতকে হত্যা করার সমতুল্য। এমনকি যে নারী গর্ভপাতের মাধ্যমে ভ্রূণ হত্যা করে সে যেন তাঁর জাত, কুল সমস্তই বিনষ্ট করে।[২১] অর্থাৎ হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতিতে গর্ভপাতকে চরম নিন্দনীয় কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে: "বিষ্ণু নিজেই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ নবজাতকের অভিভাবক" (*ঋগ্বেদ*- ৭, ৩৬: ৯)। অর্থাৎ ভ্রূণের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব নিয়েছেন বিষ্ণু নিজে। সেক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ হত্যা করা হবে মহাপাপ। আবার, *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে: "যে মহিলা তার শরীর থেকে ভ্রূণ বের করেছে, সে নিঃসন্দেহে মহাপাপ করেছে" (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ৩:১.২.২.১)।

আবার, *উপনিষদ* অনুযায়ী, একটি আত্মা বা প্রাণ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় থাকাকালীন শেষ মাসে তার বিগত জীবনের স্মৃতি স্মরণে আসে এবং জন্মকালীন নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক আঘাতের ফলে সব কিছুর বিস্মরণ ঘটে।[২২] এসব শাস্ত্রীয় বিবৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে কোনোভাবেই গর্ভপাতকে সমর্থন করা হয় না। তবে উদারপন্থী হিন্দু পণ্ডিতগণ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জীবন রক্ষার স্বার্থে যদি গর্ভপাত করাতে হয় সেক্ষেত্রে তারা সেটিকে সমর্থন দিয়ে থাকেন।

আবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে খ্রিস্টান ধর্মও গর্ভপাতের বিরোধিতা করে। খ্রিস্টানদের নিকট মানবজীবন পবিত্র (sanctity) এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি উপহার যা শ্রদ্ধা ও সুরক্ষিত হিসেবে রাখতে বলা হয়। এই শিক্ষাকে বলা হয় জীবনের পবিত্রতা। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছিল এবং পাশাপাশি এটিও শিক্ষা দেয় যে হত্যা নিষিদ্ধ। যিশু তাঁর অনুগামীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক প্রাণী ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান। সে বিবেচনায় ভ্রূণ হত্যা করাও নিষিদ্ধ। নারীর গর্ভধারণের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মমত অনুযায়ী প্রথম ভ্রূণ সঞ্চালন হলো এমন একটি সময় যখন মা প্রথম ভ্রূণের গতি (motion) অনুভব

করেন। চিরায়ত ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব অনুসারে প্রথম ভ্রূণ সঞ্চালনের সময় ভ্রূণের মধ্যে আত্মা প্রাপ্তি হয়। খ্রিস্টীয় মতবাদ অনুসারে মনে করা হয় যে 'আত্মা' (soul) হলো মানুষ থেকে মানবেতর প্রাণীকে পৃথক করার জন্য একটি সীমারেখা।[২৩] অনেক রোমান ক্যাথলিক এবং রক্ষণশীল খ্রিস্টানসহ কিছু খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকগণ বিশ্বাস করেন যে গর্ভধারণের সময় থেকেই মানুষের জীবন শুরু হয়। তাই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চালনের পর সেটিকে হত্যা করা অন্যায়। তবে কিছু উদার খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে গর্ভবতী মা এবং সন্তানের যদি মৃত্যুঝুঁকি থাকে, সেক্ষেত্রে গর্ভপাতকে সমর্থন করা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গর্ভপাত নিয়ে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেও মত পার্থক্য রয়েছে, যা বাংলাদেশের খ্রিস্টান নাগরিকদের ক্ষেত্রেও বিবেচনার বিষয়।

গর্ভপাত বিষয়ক নৈতিক সমস্যা বৌদ্ধ ধর্মমতেও তৈরি হয়। বৌদ্ধ ধর্ম গর্ভপাতের মতো জীবিত সত্তাকে হত্যা করা সমর্থন করে না, কারণ এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনকে হত্যা করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, কোনো জীবনকে অবহেলা করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মোটেও উচিত নয়। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে মানব ভ্রূণ একটি জীবন্ত সত্তা এবং গর্ভপাতও এক ধরনের হত্যা বলে বিবেচিত হবে। তবে গর্ভবতী মা এবং সন্তানের মৃত্যুর ঝুঁকি থাকাকালীন অবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মমতে সংকটের তৈরি হয়। কারণ, গর্ভবতী নারীকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে যদি গর্ভপাত করাতে হয় সেক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মমতের সাথে সেটি বিরোধপূর্ণ হবে। এজন্য এই ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে গর্ভপাতের মতো বিষয়ে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাস খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় গর্ভপাতের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের মতামতের পাশাপাশি রোগীর নিজস্ব মতামত তথা ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা জরুরি। তবেই চিকিৎসক এবং রোগীর পারস্পরিক স্ব-শাসন নিশ্চিত হবে। গর্ভপাত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো বিবেচনায় না এনে বাংলাদেশে গর্ভপাতের আইন তৈরি করলে সেটি দেশের নাগরিকদের নিকট সমর্থনযোগ্য হবে না।

৪.১.২ অঙ্গ-প্রতিস্থাপন

গত শতাব্দীতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে সকল সুদূরপ্রসারী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার মধ্যে অঙ্গ-প্রতিস্থাপন (organ transplantation) অন্যতম। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি অঙ্গ-প্রতিস্থাপন কিছু নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। কারণ, অঙ্গ দান এবং প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধ জড়িত থাকে। ধর্মীয় কারণগুলি অঙ্গ দান এবং অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের অনেক পরিস্থিতিতে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নীতিসমূহ যদি মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তবে এটি তাদের স্ব-শাসন লঙ্ঘন করবে এবং মানুষ অঙ্গ দানের ক্ষেত্রে কম আগ্রহ দেখাবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মত ইস্যুতে এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন

সবচেয়ে বেশি হতে হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ অঙ্গ পাচার এবং অবৈধ অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ব্যবসা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের মাঝে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো পরিষ্কার করতে পারলে জনগণ অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনে উৎসাহ পাবে।

অঙ্গ সংরক্ষণের প্রধান দুটি উৎস হচ্ছে ১. জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ (living donor) এবং ২. মৃত ব্যক্তির অঙ্গ (cadaveric donor)। উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্গ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন নৈতিক প্রশ্ন তথা প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়, একই সাথে রোগীর অঙ্গ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সামাজিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস বাধা সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ অঙ্গদানের ক্ষেত্রে কম আগ্রহী হয়।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলিম বিশ্বাস করেন যে ইসলাম অঙ্গদানকে নিষিদ্ধ করেছে। যেসব মুসলিম অঙ্গ দানের বিরুদ্ধে অবস্থান করেন তারা বিশ্বাস করেন যে , *কোরআন*- এ যেহেতু সরাসরি অঙ্গ দানের ব্যাপারে উল্লেখ নেই, তাই ইসলামে অঙ্গ দান গ্রহণযোগ্য নয়। আরেকটি বিশ্বাস হলো আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের দেহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবেন। ইসলামী রীতি অনুযায়ী মৃত্যুর পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করতে হয়। তাই মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ সংরক্ষণকে সমর্থন করা যায় না। পাশাপাশি মুসলিমদের বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে যে, মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন এই দেহ আবার পুনরুত্থিত হয়।[২৫] তাছাড়া হাশরের ময়দানে (judgement day) মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের ভাল কাজের এবং মন্দ কাজের জন্য সাক্ষী দেবে। *আল-কোরআন*- এ বলা হয়েছে:

> আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের। (*আল-কোরআন*, ইয়াসীন ৩৬: ৬৫)

আবার, আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

> অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (*আল-কোরআন*, হা-মীম সেজদাহ ৪১: ২০)

এ আয়াত দুটো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মতো বিষয়টি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসের সাথে বিরোধপূর্ণ হতে পারে। তবে উদারপন্থী ইসলামি চিন্তাবিদরা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কোনো মানুষের জীবন বাঁচানোকে সমর্থন করে থাকেন। কারণ, *আল-কোরআন*- এ বলা হয়েছে- "...যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল" (*আল-কোরআন*, আল-মায়েদা, ৫: ৩২)। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, অন্যের প্রাণ বাঁচানো যেহেতু একটি পবিত্র কাজ সেহেতু অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা ইসলামে বিরোধপূর্ণ হতে পারে না।

অন্যদিকে সনাতন হিন্দু ধর্মমতেও অঙ্গ-প্রতিস্থাপককে সমর্থন করা হয়। নিঃস্বার্থভাবে দান (*daan*) করাকে হিন্দু মতে একটি পুণ্য কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু মতে দশটি পুণ্য কাজের মধ্যে দান হচ্ছে তৃতীয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনের পর মৃত্যু হচ্ছে পুনর্জন্মের একটি চলমান

প্রক্রিয়া। এই ধারণাটিকে অঙ্গদান এবং প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা যায়। মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যাবে সেটি কর্মের (*karma*) বিধান দ্বারা নির্ধারিত হয়।[২৬]

হিন্দু শাস্ত্রে অঙ্গদানকে সমর্থন করা হয় কারণ এটি অন্য একটি মানুষের জীবন রক্ষা করে। *ভগবত গীতা*-য় নশ্বর দেহ এবং অমর আত্মার সম্পর্কের সাথে, পোশাকের সাথে দেহের সম্পর্কের তুলনা করা হয়েছে। *ভগবত গীতা*-য় বলা হয়েছে:

> কোনো ব্যক্তি জরাজীর্ণ পোশাকগুলো ত্যাগ করে যেমনভাবে অন্য নতুন পোশাক গ্রহণ করে, একইভাবে মূর্ত আত্মা, জীর্ণ দেহগুলো ফেলে দেয় এবং অন্য নতুন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। (*ভগবত গীতা*, ২: ২২)

সুতরাং একজন ব্যক্তি জীবিত থাকাকালীন তার দেহের যত্ন নেওয়া উচিত, কারণ এটি ঈশ্বরের গৃহস্বরূপ। এমনকি মৃত্যুর পরেও শবদাহের সময় সম্মান দেখানো উচিত। হিন্দু পুরাণে এমন অনেক আচার (ritual) রয়েছে যা অন্যের উপকারে দেহের কোনো অঙ্গদান এবং ব্যবহারকে সমর্থন করে। সুতরাং, সনাতন হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গদান করা দাতার জন্য একটি আধ্যাত্মিকভাবে সুবিধাজনক কাজ বলে বিবেচিত হবে।[২৭]

আবার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কে খ্রিস্টীয় মতের প্রধান শাখাগুলি ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়ই অঙ্গ-প্রতিস্থাপনকে সমর্থন করে এবং উৎসাহ দেয়। যিশু মানুষকে একে অপরকে ভালবাসতে এবং অন্যের প্রয়োজনকে আলিঙ্গন করতে শিখিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা অঙ্গদান বা অনুদানকে প্রেমের কাজ এবং যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করার উপায় বলে মনে করেন। পোপ জন পল (২য়) অঙ্গ দান এবং প্রতিস্থাপনকে সমর্থন করে এটিকে 'জীবনের জন্য সেবা'– হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮]

অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মমতে অঙ্গদান এবং প্রতিস্থাপনকে সমর্থন করা হয় না। বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী মৃতদেহকে প্রকৃতি এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান রেখে অক্ষত রাখতে হয়। তাই মৃত্যুর পরে শবদাহ করার আগে কোনো মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ বের করে আনা সমর্থনযোগ্য নয়।[২৯] তবে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান সময় থেরাবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় অঙ্গদান এবং প্রতিস্থাপনকে সমর্থন করে।[৩০] মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের সহায়তা করা বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে পড়ে এবং সেটি অঙ্গদানের ক্ষেত্রেও অন্তর্ভুক্ত হবে। বৌদ্ধ ধর্মের এই দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গদানকে উদারতার কাজ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ইস্যুতে আমরা মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশের নাগরিকদের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ এবং অঙ্গ পাচার রোধে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে অবগত করা বাধ্যতামূলক। তবেই অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মিত আইন সব ধর্মের নাগরিকদের কাছে সমর্থনযোগ্য হবে।[৩১] চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে

এই বিষয়গুলো বজায় রাখা খুব কঠিন। এই ধরণের ঘটনাগুলো পরিচালনা করার জন্য চিকিৎসকদের অবহিত থাকা উচিত এবং রোগীদের তাদের মতামত এবং নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়গুলি চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। চিকিৎসক যখন রোগীদের দ্বারা তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় জানবে এবং সেইসাথে রোগীরা চিকিৎসকের কাছ থেকে তাদের রোগ এবং চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে অবহিত হবেন তখনই অবগতি সম্মতি (informed consent) সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হবে। অবগতি সম্মতি হলো রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মধ্যে যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অনুসারে প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসার আগে চিকিৎসার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার অধিকার রয়েছে। এই অবগতি সম্মতিই রোগীর স্ব-শাসনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে এবং বাংলাদেশের মানুষকে অঙ্গদান এবং অঙ্গ-প্রতিস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন এর ভাল দিক হচ্ছে 'সন্ধানী'[৩২] প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্বারা মৃত ব্যক্তির চক্ষুদান থেকে অনেক মানুষ পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছে। এমনকি বর্তমানে অনেক সচেতন ব্যক্তি মেডিকেল কলেজে নিজেদের মরণোত্তর দেহ দান করে যান।

৪.১.৩ চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক

চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্ক কেমন হবে এটি সব সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সেক্ষেত্রে অনেকগুলো মূলনীতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু এই মূলনীতিগুলো সব সংস্কৃতি এবং সমাজে প্রযোজ্য নয়। একই সাথে জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, চিকিৎসা সরঞ্জামের সুষম বণ্টন না হওয়া, মানুষের নৈতিক চিন্তা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ভিন্নতা প্রভৃতি কারণে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের সার্বিক কোনো মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। গত শতাব্দীতে নীতিদার্শনিকগণ চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল হচ্ছে ইজেকিয়েল ইমানুয়েল এবং লিন্ডা ইমানুয়েল প্রস্তাবিত মডেলটি। এটিকে 'চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কের চার মডেল' (four models of the physician-patient relationship) বলা হয়ে থাকে।[৩৩] এই চারটি মডেল হচ্ছে যথাক্রমে: ১. পিতৃতান্ত্রিক মডেল (the paternalistic model), ২. তথ্যপূর্ণ মডেল (the informative model), ৩. ব্যাখ্যামূলক মডেল (the interpretive model), ৪. পরামর্শমূলক মডেল (the deliberative model)।

পিতৃতান্ত্রিক মডেলটি হলো অনেকটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার সঙ্গে তুলনীয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মডেলটি দাবি করে যে একমাত্র চিকিৎসকই ভালো জানেন। চিকিৎসকের এই ভালো জানার অর্থ হলো রোগীর স্বার্থ, রোগীর কল্যাণ কিভাবে বৃদ্ধি পাবে তা নিয়ে একমাত্র চিকিৎসকই ভাববেন, অন্য কাউকে ভাবতে হবে না। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মডেলের একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও সহজ করা যেতে পারে। যেমন, সন্তান জন্মদানের সময় কোনো গর্ভবতী নারীর

যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিবেন গর্ভপাত করার। এক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীর ব্যক্তিগত মতামত গ্রহন কিংবা বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা অপেক্ষা চিকিৎসকের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক।[৩৪] অর্থাৎ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং এক্ষেত্রে রোগীর সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় মডেলটি হচ্ছে তথ্যপূর্ণ মডেল বা অবগতি সম্মতি (informed consent)। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ মডেল অনুযায়ী চিকিৎসক রোগীকে কোনো ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন সে বিষয়ে আগে থেকেই রোগীকে অবগত (informed) করবেন। অর্থাৎ রোগী তার নিজ চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেই জানতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে ভালো মন্দ বিচার করার স্বাধীনতা থাকবে। অবগতি সম্মতি দ্বারা প্রধানত দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা পায়। এক হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রোগীর নিরাপত্তা এবং অপরটি হচ্ছে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় মডেলটি হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক মডেল। এখানে চিকিৎসক রোগীকে রোগীর রোগ সংক্রান্ত সমস্ত সঠিক, উপযুক্ত এবং সত্য তথ্য সরবরাহ করে রোগীকে সহায়তা করে। এই মডেলের উদ্দেশ্য হলো রোগীর সঠিক মূল্যায়ন এবং রোগী আসলে কী চায় তা ব্যাখ্যা করা। এখন তথ্যপূর্ণ মডেল এবং ব্যাখ্যামূলক মডেল এই দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, তথ্যপূর্ণ মডেলে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকা থাকে সক্রিয়। অপরদিকে ব্যাখ্যামূলক মডেলে চিকিৎসকের ভূমিকা থাকে নিষ্ক্রিয়।

সর্বশেষ মডেলটি হচ্ছে পরামর্শমূলক মডেল। চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের এই মডেলটিতে চিকিৎসক রোগীর সাথে রোগীর একজন শিক্ষক বা বন্ধু হিসেবে আচরণ করে। মডেলটি রোগীর মূল্যবোধগুলোর নৈতিক বিবেচনার উপর জোর দেয়। এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক রোগীকে কিছু নৈতিক মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন যা তার রোগ এবং চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত। ফলস্বরূপ রোগী গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে পারে। সুতরাং, এই মডেলটিতে একজন চিকিৎসকের লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিক অনুশাসন, জবরদস্তি নয়।

আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক এবং এখানে চিকিৎসক রোগীর অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মডেল চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য তৈরি করে, যেখানে চিকিৎসকের অবস্থানকে উচ্চতর হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় এবং রোগীর অবস্থান মূল্যায়িত হয় নিকৃষ্টতর হিসেবে। তবে এই মডেলটি সব দেশেই জরুরী অবস্থায় রোগীর জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত।[৩৫] বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য পিতৃতান্ত্রিক মডেলটি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে

উপকারী। কারণ, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষিত নয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীর চেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মডেলটির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হলো এটি রোগীর স্ব-শাসন লঙ্ঘন করার পাশাপাশি রোগীর সম্মানকেও ক্ষুন্ন করে। তাছাড়া নীতিবিদগণ পিতৃতান্ত্রিক মডেলের প্রচুর সীমাবদ্ধতা এবং স্বাধীনতাবিরোধী বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। যেমন ইজেকিয়েল ইমানুয়েল এবং লিন্ডা ইমানুয়েল দাবি করেছেন যে, পিতৃতান্ত্রিক মডেল চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ তৈরি করে। কারণ চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার নৈতিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুরূপ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে সেটি যদি রোগীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে রোগীর স্ব-শাসন লঙ্ঘিত হবে।[৩৬] বাংলাদেশে নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, তাই চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্কের বেলায় সবক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং রোগীর পারস্পরিক মূল্যবোধ অভিন্ন নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে যদি ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধ ঘটে তাহলে চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের স্ব-শাসন ব্যাহত হবে এবং বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাবে। কারণ ধর্মীয় অনুভূতিকে বরাবরই এদেশের সমাজে স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে দেখা হয়। সুতরাং, বাংলাদেশের মতো দেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক পিতৃতান্ত্রিক হওয়াটা অনুপোযোগী। এক্ষেত্রে একটি বিকল্প মডেলকে বিবেচনায় আনতে হবে। এই বিকল্প মডেল হিসেবে প্রস্তাব করা যেতে পারে স্ব-শাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মডেলটিকে (relational model of autonomy)।

সম্পর্কযুক্ত হওয়ার অর্থ আন্তঃসংযুক্ততার স্বীকৃতি হিসাবে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। যেমন পরিবেশের মধ্যে মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীর সাথে উদ্ভিদকূলের যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তেমনটি। সম্পর্কযুক্ত স্ব-শাসন ধারণাটি এসেছে নারীবাদী ধারণা থেকে। এই ধারণাটি চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় প্রচলিত কেয়ার ইথিকস (care ethics)- এর ধারণা থেকে পাওয়া যায়, যেখানে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার পাশাপাশি চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'যত্নশীল হওয়া' বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সম্পর্কযুক্ত স্ব-শাসন (relational autonomy) বলতে কোনো একক ধারণাকে বোঝায় না। বরং এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে, যে দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অনেকগুলো বিষয়কে একত্রিত করা হয়। এটি মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের সামাজিক প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্ব-শাসনকে নির্দেশ করে। এই মতানুযায়ী মানুষ জাতিসত্তা, লিঙ্গ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত একটি সামাজিক পরিবেশের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত এবং তাদের পরিচয় তাদের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয়।[৩৭]

বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ব-শাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মডেলটিকে সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, এই মডেলটি মানুষের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক মূল্যবোধগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করে। চিকিৎসক

এবং রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্ব-শাসন রক্ষার জন্য এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয়। চিকিৎসা নীতিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোগীর ধর্মীয় সংস্কৃতি চিকিৎসা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হতে দেখা যায়। যদি চিকিৎসা নীতি রোগীর ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে বিরোধপূর্ণ হয় তবে রোগীর স্ব-শাসন লঙ্ঘিত হবে। কারণ, কখনও কখনও রোগীর নিকট রোগীর স্বর্গীয় পরিত্রাণ নিজের জীবন বাঁচানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে একজন চিকিৎসকের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় রোগীর জীবন বাঁচানোকে। স্ব-শাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মডেলটি যেহেতু রোগীর ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্য বিবেচনা করে, তাই চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশের জন্য উপযোগী।[৩৮] কিন্তু বিপুল জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, দক্ষ চিকিৎসকের স্বল্পতা, হাসপাতালের অপর্যাপ্ততা, চিকিৎসা খাতে দুর্নীতি, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির মতো কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশে চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মডেলের প্রয়োগ অনেকটা চ্যালেঞ্জ সাপেক্ষ। কিন্তু, এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে স্ব-শাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মডেলটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ মডেল হিসাবে বিবেচিত হবে।

৪.২ সংস্কৃতি ও জৈবপ্রযুক্তি

চিকিৎসা নীতিবিদ্যার পর বর্তমান সময়ে প্রাণনীতিবিদ্যার আরেকটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে জৈবপ্রযুক্তি (biotechnology)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিবেশের নানা ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও কৃষিখাতে এর ব্যাপক প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জৈব নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্টাজেনা প্রটোকল অনুসারে আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে আয়োজিত জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত সম্মেলনে আধুনিক জৈব প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়:

> The application of in vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid DNA and direct injection of nucleic acid into cells or organelles.[৩৯]

অর্থাৎ জৈবপ্রযুক্তি হচ্ছে, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সরাসরি কোনো জীবকোষে প্রয়োগ করার কৌশল। জৈবপ্রযুক্তির সাফল্যের কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনে জিএম ফুড (genetically modified food)-এর ব্যবহার, ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)-এর ব্যবহার, উদ্ভাবিত শস্য ও অ-মানব প্রাণীর জেনেটিক মডিফিকেশন, পোকা প্রতিরোধী বিটি বেগুন উদ্ভাবন, জৈব গ্যাস উদ্ভাবন, মাছের ক্রোমোজোমের ম্যানিপুলেশন, বায়োমেডিসিন উৎপাদন, টিস্যু কালচার প্রযুক্তি প্রভৃতি। এখন প্রশ্ন হতে পারে– জৈবপ্রযুক্তি কেন? জৈবপ্রযুক্তির প্রধান অবদান হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তায়। কারণ, অনেক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট দাবি করছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে আমাদের সনাতন খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বরং এ চাহিদা মেটাতে কৃষি ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে জৈবপ্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম

হবে।[৪০] খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একই প্রসঙ্গ MDGs ২০০০- এর ঘোষণাতেও লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) জৈব প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেছে।[৪১] একই তথ্যাদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-তেও বলা আছে।[৪২] কারণ জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এবং একই সাথে পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রতিবেশের (ecology) উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। জৈবপ্রযুক্তিতে অ-মানব প্রাণীর উপর নির্বিচারে গবেষণা চালানো হয়। অ-মানব প্রাণীর উপর এই নির্বিচারে গবেষণা এবং এর ব্যবহারকে দার্শনিক পিটার সিঙ্গার প্রজাতিবাদ (speciesism) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৩]

অর্থাৎ মানব সম্প্রদায় যে অনৈতিকভাবে এবং নির্বিচারে অ-মানব প্রাণীকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও নৈতিক নির্দেশনা থাকা জরুরী। জৈবপ্রযুক্তির অবদান থেকে সৃষ্ট বহুবিধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং পলিসি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কারণ জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার একইসাথে পরিবেশ এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। রিচার্ড স্টোন দাবি করছেন আমাদের বিদ্যমান মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের সঙ্গে জৈবপ্রযুক্তি বিরোধপূর্ণ।[৪৪] রিচার্ড স্টোনের এই দাবিটি আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক। একই সাথে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবেশ ও মানবিক সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই পর্যায়ে জৈবপ্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কিছু পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে।

জৈবপ্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে দুটি যুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তি দুটি হলো- ১. অন্তর্নিহিত যুক্তি (intrinsic arguments) এবং ২. বাহ্যিক যুক্তি (extrinsic arguments)। অন্তর্নিহিত যুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: ক. জৈবপ্রযুক্তি প্রজাতির প্রাকৃতিকতার (naturalness) নীতিকে বিনষ্ট কর। খ. জৈবপ্রযুক্তি প্রকৃতি এবং লক্ষিত প্রজাতির জৈব-সামগ্রিকতার (organic wholenes) শর্তকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। গ. জৈবপ্রযুক্তি হলো ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা (playing with god)।[৪৫]

জৈবপ্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গে অন্তর্নিহিত যুক্তির মধ্যে 'ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা করা'– এই ধারণাটি সব সিমেটিক ধর্মগুলোতে (ইসলাম, খ্রিস্টান, ইহুদি) বেশ আলোচিত। খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত নীতিদার্শনিকগণ জৈবপ্রযুক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা যুক্তিটি উত্থাপন করেছেন। ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপের উপর ভিত্তি করে যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *আদি বাইবেল (Old Testament)*-এ বলা হয়েছে যে,

> ঈশ্বর তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ তোমার অন্তরতম সত্তা হিসেবে। আমাকে তুমি মায়ের গর্ভে স্থাপন করেছ। আমি তোমার প্রশংসা করি, আমি অসম্ভব আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টি হয়েছি। হে স্রষ্টা তোমার সবই আশ্চর্যময়, আর সবই শুভ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। (Psalm 139: 13-14)

বাইবেল-এর এই ভাষ্য অনুযায়ী মানবজাতির জন্ম এবং জন্মের প্রক্রিয়া সবই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর আমাদের শরীর সৃষ্টি করেছেন, আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মতৎপরতা, দেহের বিকাশ, রোগব্যাধি, রোগমুক্তি সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ সবকিছুই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কিন্তু জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মহাপরিকল্পনাকে অস্বীকার করে। এ প্রযুক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ছাপিয়ে মানুষের শক্তি ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়।[৪৬] এভাবে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় নিজেকে অবতীর্ণ করে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে, ঈশ্বর যেহেতু আগে থেকেই প্রকৃতির সবকিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তাই মানুষের এই পরিকল্পনার বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। তাদের মতে জৈবপ্রযুক্তি হলো ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পনার বিকল্প। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতির রোডম্যাপিংকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা বা তামাশা করা। খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে এই যুক্তিকে জৈবপ্রযুক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন সি.এ.জে কোডি। কোডি বলছেন– সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ বিশ্বজগৎ, উদ্ভিদ, মানুষ, অমানব প্রাণী ও প্রকৃতি নিয়ে পূর্ব থেকেই একটি রোডম্যাপ নির্মাণ করে রেখেছেন। কিন্তু জৈবপ্রযুক্তি ঈশ্বর নির্মিত এই সুদীর্ঘ রোডম্যাপকে অস্বীকার করে।[৪৭]

'ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা করা'– এই যুক্তিটি জৈবপ্রযুক্তির বিরুদ্ধে খুব জোরালো ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি হলেও অনেক উদারপন্থী খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকগণের বক্তব্য হচ্ছে *বাইবেল*- এ মানুষের স্বরূপ এবং শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেমন *আদি বাইবেল*-এ বলা হয়েছে:

> এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি, যেন তারা সমুদ্রের মাছেদের উপরে এবং আকাশের পাখিদের উপরে, গৃহপালিত পশুদের ও সব বুনো পশুর উপরে, এবং জমির সব সরীসৃপ প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করে। (Genesis 1: 26)

বাইবেল- এর এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে জগতের সবকিছুর উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার করার অধিকার ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছে। মানুষ চাইলে এর ব্যবহার এবং সংস্কার করতে সক্ষম। এই পরিপ্রেক্ষিতে জৈবপ্রযুক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত 'ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা করা' যুক্তিটিকে আর জোরালো যুক্তি বলা যায় না।

আবার 'ঈশ্বরের সঙ্গে ছলাকলা করা'– জৈবপ্রযুক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই যুক্তিটি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মাঝেও প্রচলিত রয়েছে। কারণ, *কোরআন*- এ আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, তিনিই একমাত্র যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করার মূল ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে (*আল-কোরআন*, আল ইমরান ৩: ১৯০)। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কিছু তৈরি করার ক্ষমতা মানুষের নেই। *কোরআন*- এ প্রকৃতির জীবন্ত জিনিসগুলোর পরিবর্তন করাকে পাপের শামিল হিসেবে দেখা হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে:

> আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা

> আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (*আল-কোরআন*, আন নিসা ৪: ১১৯)

কোরআন-এর এই বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা যে, আল্লাহর সৃষ্টির অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা আল্লাহ এবং নবীর পক্ষ থেকে অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে পরিবর্তনটি যদি প্রয়োজনীয় ধরনের (*daruriyyat*) হয় তাহলে সেটি অনুমোদিত হবে। উদাহরণস্বরূপ জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার যদি পরিবেশ এবং প্রতিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে এবং প্রকৃতির সাথে যদি সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে জৈবপ্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। পাশাপাশি এটি ইসলামি শরিয়া নীতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যা কল্যাণ প্রচার করবে এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।[৪৮] অতএব, ধর্মীয় বিবেচনায় যেহেতু জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার অগ্রহণযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। পাশাপাশি সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে সেটি সাংঘর্ষিক হবে না।

কিন্তু জিএম ফুড (GM Food) গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে মতভেদ থাকতে পার। জিএম ফুড হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড (genetically modified food)। জিন সংযোজন ও জিন বিয়োজন করে জিন কাঠামো বা ডিএনএ এর গঠন পরিবর্তন করে উৎপাদিত বা উদ্ভাবিত খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফল, মাছ, মুরগি, দুধ ইত্যাদি খাদ্য হচ্ছে জিএম ফুড। এক জীব থেকে অন্য জীবের ডিএনএতে জিন প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জিন পারস্পরিক সংযোজন বা বিয়োজন হতে পারে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জিনগতভাবে রূপান্তরিত বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন দেয়। বিটি বেগুন চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৯তম দেশ হিসেবে জিএম শস্য উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় নাম লেখে।[৪৯] পাশাপাশি বর্তমানে বিদেশ থেকেও অনেক ধরনের জিএম ফুড বাংলাদেশে আমদানি হচ্ছে।

বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে জিএম ফুড গ্রহণে মুসলিমদের মধ্যে সংকোচ থাকতে পারে। কারণ, ইসলামে সর্বদা হালাল খাবার গ্রহণ এবং হারাম খাবার বর্জন করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। *কোরআন*- এ বলা হয়েছে:

> আল্লাহ তায়ালা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (*আল-কোরআন*, আল মায়িদাহ ৫: ৮৮)

এ বিবৃতি থেকে অনুমান করা যায়, আল্লাহ মুসলিমদের কেবল হালাল খাবারই নয়, পাশাপাশি ভাল খাবার গ্রহণেরও আদেশ দিয়েছেন। এমন কোনো খাবার গ্রহণ করা উচিত নয় যেগুলো হারাম খাবার থেকে সংগৃহীত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং যেগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে হালাল এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয় এমন জিএম ফুড গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে কোনো বিরোধিতা নেই। তবে জিএম ফুড-এ যদি এমন কোনো খাদ্য উপাদান

মিশ্রিত থাকে যেগুলো ইসলাম অনুসারে হারাম, তাহলে বাজারজাতকরণের সময় অবশ্যই ক্রেতা বা খাদ্য গ্রহীতাকে সেই বিষয়ে অবগত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি খাবারের সাথে খাদ্য উপাদানের লেবেলিং (labelling) করা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে মত বহু সংস্কৃতির দেশের ক্ষেত্রে জিএম ফুডের বিষয়টিতে মুসলিম ছাড়াও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। কেননা জিএম ফুডে এমন কোনো খাদ্য উপাদান থাকতে পারে যেগুলো গ্রহণ খাদ্য গ্রহীতার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্মীয় বা সামাজিক বিশ্বাসের সাথে বিরোধপূর্ণ হতে পারে। যেমন- জেনেটিকালি মডিফাইড কোনো খাদ্যশস্য বা সবজির মধ্যে যদি প্রাণিজ কোনো উপাদান বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটি নিরামিষভোজী বা সবজিভোজী (vegetarian) ব্যক্তিকে আগে থেকেই অবগত করতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মধ্যে যেহেতু আমিষের চাহিদা পূরণে গরু এবং শুকরের মাংস খাওয়া নিয়ে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে গরু এবং শুকরের মাংস বা অন্যান্য উপাদান (যেমন- অ্যালকোহল) দ্বারা জিএম ফুড উৎপাদনে বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনকারীর অবশ্যই ভোক্তাকে অবহিত করতে হবে এবং প্রতিটি খাদ্যের সাথে খাদ্য উপাদানের (ingredient) একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা দিতে হবে। নীতিবিদ্যার ভাষায় যা হচ্ছে অবগতি সম্মতি।

বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা জিএম ফুডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।[৫০] এক্ষেত্রে কোন খাদ্যদ্রব্যে জিএম ফুড অর্গানিজম (GMO) রয়েছে এবং কোনটিতে জিএম ফুড অর্গানিজম নেই (non-GMO) সেটির ফুড লেবেলিং করা খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[৫০] তবে বাংলাদেশে জিএম ফুড গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে নীতি নির্ধারকরা এখনো সচেতন নন। জিএম ফুডে খাদ্য উপাদানের সুনির্দিষ্ট তালিকা না দেওয়া হলে সেটি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। দেশের জনগণ যখন সুনিশ্চিত হতে পারবে যে জিএম ফুড গ্রহণ তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে খর্ব করছে না তখনই তারা জিএম ফুড গ্রহণে আগ্রহী হবে।

৫. উপসংহার

প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে একটি সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রাণনীতিবিদ্যার কাঠামো নির্মাণে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গস্বরূপ বাংলাদেশকে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে প্রাণনীতিবিদ্যার কিছু উল্লেখযোগ্য ইস্যু যেমন: চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় গর্ভপাত, অঙ্গ-প্রতিস্থাপন, চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক এবং একই সাথে জৈবপ্রযুক্তির মত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এসব বিষয়ের সাথে কিভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ জড়িত, সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুসারে সেসব বিষয়ের একটি সম্যক ধারণা প্রণয়ন করা হয়েছে। গর্ভপাত প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ দিয়ে এর শুরু। বাংলাদেশের আইনে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হলেও অগোচরে এই ঘটনাটি দিন

দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি গর্ভপাতের সাথে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গর্ভপাত নিয়ে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন মতভেদ দৃশ্যমান। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়গুলি গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কেননা যেকোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিবেচনায় না এনে গর্ভপাত ঘটানোর ক্ষেত্রে রোগীর স্ব-শাসন নিশ্চিত সম্ভব হবে না। এমনকি সমাজ বিষয়টিকে সাংস্কৃতিকভাবে ইতিবাচক মনে না করলে তা অবৈধ চর্চায় পরিণত হবে এবং সেটা সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর হবে না, এবং বর্তমানে হচ্ছেও তাই। কারণ একটি সমাজের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ঐ সমাজের মানুষের সম্মতি ও প্রতিরোধ- এ দুইয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয় অঙ্গ-প্রতিস্থাপন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মত ঘটনাটি আমাদের কিছু নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এগুলোর মধ্যে অঙ্গ দাতা এবং গ্রহীতার সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিও বিবেচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের নাগরিকদের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের আইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা বাধ্যতামূলক। তবেই অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মিত আইন সব ধর্মের নাগরিকদের কাছে সমর্থনযোগ্য হবে এবং জনগণ অঙ্গ দান এবং অঙ্গ-প্রতিস্থাপনে উদ্বুদ্ধ হবে। অন্যথায় দেশে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের অবৈধ চর্চা আরম্ভ হবে এবং ফলস্বরূপ অঙ্গ পাচার বৃদ্ধি পাবে। চিকিৎসা নীতিবিদ্যার সর্বশেষ যে দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে সেটি হচ্ছে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং এক্ষেত্রে রোগীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যদিও বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল এবং স্বল্প শিক্ষিত জনগণের রাষ্ট্রের জন্য এই পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী, কিন্তু এতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীর স্ব-শাসন নিশ্চিত হয় না। কারণ চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় রোগীর ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, জ্ঞান, অনুশীলন প্রভৃতি জড়িত থাকে। সেগুলো বিবেচনায় না এনে যদি কেবল চিকিৎসকের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে রোগীর স্ব-শাসন বিঘ্নিত হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্কের বিকল্প মডেল হিসেবে প্রস্তাব করা যেতে পারে 'স্ব-শাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত' মডেলটিকে। কারণ, এই মডেলটি এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক মূল্যবোধগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। বাংলাদেশের চিকিৎসা নীতিমালায় এই বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রাণনীতিবিদ্যায় সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অশিক্ষা, চিকিৎসা সম্পর্কে অজ্ঞতা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, চিকিৎসা সরঞ্জামের সুষম বণ্টনের অভাব প্রভৃতি সমস্যার কারণে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো গৌণ হয়ে যায়। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থার মত মৌলিক অধিকারকে সব শ্রেণির মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করতে পারেনা, সেখানে প্রাণনীতিবিদ্যায় মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো স্বাভাবিকভাবেই কম গুরুত্বের সাথে দেখা হবে। আবার জৈবপ্রযুক্তির মতো বিষয়ে

জিএম ফুড গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো বিবেচনা করা উচিত। জিএম ফুড যদি জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে জিএম ফুডের ব্যবহার বাংলাদেশে কখনই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না। সেজন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI)- কে ফুড লেবেলিং এর ক্ষেত্রে জিএমও এবং নন-জিএমও খাদ্য উপাদানের সুষ্ঠু তালিকা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে। তবেই ভোক্তার স্ব-শাসন সুনিশ্চিত হবে। এই স্ব-শাসন বিষয়টি যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তাহলে এদেশে প্রাণনীতিবিদ্যার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাই বাংলাদেশে প্রাণনীতিবিদ্যার উদ্দেশ্যকে সফল করতে নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই দেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি ইউনেস্কো- এর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণনীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি যুৎসই শিক্ষানীতি নির্মাণ করা অপরিহার্য, যেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য নীতিবিদ্যার জ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানকেও অভিবাদন জানানো হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা। এর পূর্ণরূপ– The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization বা ইউনেস্কো (UNESCO)। এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা। এই সংস্থার কার্যক্রম হচ্ছে বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

২. 'Universal Declaration on Bioethics and Human Rights', 2005. Retrieved November 23, 2021, from: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

৩. J. Storey, 'Cultural studies: an introduction', John Storey (ed.), *What is Cultural Studies: A Reader*, London, Edward Arnold, 1996, p. 2

৪. Ahmed Abidur Razzaque Khan and Humayra Akhter, "Politics of Theatre for Human Rights: An overview of pedagogy and good practices of *Janam* Theatre in India", *Harvest: Jahangirnagar University Studies in Language and Literature*, Vol. 35, 2020, pp. 87-104

৫. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, "শিক্ষা-কারিকুলামে প্রাণনীতিবিদ্যা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যবেক্ষণমূলক অভীক্ষা", *সমাজ ও প্রগতি*, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ২০১৫, পৃ. ১০

৬. V.R. Potter, *Bioethics: Bridge to the Future,* Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc, 1970, pp. 3-4

৭. Henk Ten Have, "Potter's notion of bioethics", *Kennedy Institute of Ethics Journal*, Vol. 22, Issue 1, 2012, pp. 59–82

৮. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, ২০১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, ২০১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১০. A. Locke, 'The ethics of culture', Leonard Harris (ed.), *The Philosophy of Alain Locke: Harlem Renaissance and Beyond*, Philadelphia, Temple University Press, 1989, p. 176

১১. Ibid., p. 177
১২. E. B. Tylor, *Primitive Culture*, New York, Harper, 1958, p. 1
১৩. T. Eagleton, *The Idea of Culture*, Malden, Blackwell Publishing, 2000, p. 12
১৪. Segun Gbadegesin, 'Culture and Bioethics', Helga Kuhse and Peter Singer (eds.), *A Companion to Bioethics*, 2nd ed., Chichester, A John Wiley & Sons Publication Ltd, 2009, p. 28
১৫. J.F. Childress and M. Siegler, "Metaphors and Models of Doctor-Patient Relationships: Their Implications for Autonomy", *Theoretical Medicine and Bioethics*, Vol. 5, Issue 1, 1984, pp. 17-19
১৬. T.L. Beauchamp and J.F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*, 5th ed., New York, Oxford University Press, 2001, p. 56
১৭. T.L. Beauchamp and J.F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*, 4th ed., New York, Oxford University Press, 1994, p. 120
১৮. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, "ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিতর্কের কয়েকটি দিক, *অন্বেষণ*", খণ্ড ১৩, ২০১৪, পৃ. ১৮০
১৯. 'Abortion of women: the end of a controversy', Retrieved August 28, 2020, from: https://lawpark.blogspot.com/2017/11/blog-post_14.html?m=1
২০. 'Abortion of women: the end of a controversy', Ibid.
২১. 'Hinduism and abortion', 2009, Retrieved August 28, 2020, from: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/hinduethics/abortion
২২. 'Infanticide and female feticide - from different religious perspectives', 2012, Retrieved August 28, 2020, from: http://www.sachalayatan.com/vabna/44867
২৩. Peter Singer, *Practical Ethics*, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 128
২৪. 'Buddhism and abortion', 2009, Retrieved August 28, 2020, from: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/buddhistethics/abortion.shtml
২৫. N. Robson, N. Dublin and A. H. Razack, "Organ Transplants: Ethical, Social, and Religious Issues in a Multicultural Society", *Asia-Pacific Journal of Public Health,* Vol. 22, Issue 3, 2010, pp. 274-275
২৬. 'A Hindu perspective on organ donation'. Retrieved August 28, 2020, from: https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/your-faith-and-beliefs/hinduism/
২৭. Ibid.
২৮. S. Scorsone, "Christianity and The Significance of The Human Body", *Transplantation Proceedings,* Vol. 22, Issue 3, 1990, pp. 943-944
২৯. SH. Sugunasiri, "The Buddhist View Concerning The Dead Body", *Transplantation Proceedings,* Vol. 22, Issue 3, 1990, pp. 947-949
৩০. 'A Buddhist perspective on organ donation', Retrieved August 28, 2020, from: https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/your-faith-and-beliefs/buddhism/
৩১. Tanvir Ahmed, "Ethical issues and challenges of organ transplantation in Bangladesh", *Eubios Journal of Asian and International Bioethics*, Vol. 31, Issue 4, 2021, pp. 237-241

৩২. বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের পথিকৃৎ 'সন্ধানী'। রক্ত দানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি মানুষের চক্ষু ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চক্ষু দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে যাতে ভবিষ্যতে সেগুলো অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে।

৩৩. EJ. Emanuel and LL. Emanuel, "Four Models of the Physician-Patient Relationship", *The Journal of the American Medical Association*, Vol. 267, Issue 16, 1992, pp. 2221- 2226

৩৪. Md. Munir Hossain Talukder, "On Patient-Physician Relationships: A Bangladesh Perspective", *Asian Bioethics Review*, Vol. 3, Issue 2, 2011, pp. 65-84

৩৫. EJ. Emanuel and LL. Emanuel, 1992, Ibid., p. 2224

৩৬. EJ. Emanuel and LL. Emanuel, 1992, bid., p. 2222

৩৭. Catriona Mackenzie and Natalie Stoljar (eds.), *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self,* New York, Oxford University Press, 2000, p. 4

৩৮. Tanvir Ahmed, "The Case of Doctor-Patient Relationship in Bangladesh: An Application of Relational Model of Autonomy", *Bangladesh Journal of Bioethics*, Vol. 12, Issue 1, 2021, pp 14-24

৩৯. 'Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity', Montreal, 2000, Retrieved November 24, 2021, from: https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf

৪০. UN, 'The 1998 Revision of the United Nations Population Projections', Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations, New York, Population Council, 1998, Retrieved August 28, 2020 from: https://www.jstor.org/stable/2808044

৪১. Philip McMichael and Mindi Schneider, "Food Security Politics and the Millennium Development Goals", *Third World Quarterly*, Vol. 32, Issue 1, 2011, pp. 119-139

৪২. Ademola A. Adenle, Hans De Steur, Kathleen Hefferon and Justus Wesseler, 'Two Decades of GMOs: How Modern Agricultural Biotechnology Can Help Meet Sustainable Development Goals', Ademola A. Adenle, Marian Chertow, Ellen H. M. Moors and David J. Pannell (eds.), *Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development Goals*, New York, Oxford University Press, 2020, pp. 401-422

৪৩. Peter Singer, 'All Animals Are Equal', Helga Kuhse, Udo Schüklenk and Peter Singer, (eds.), *Bioethics: An Anthology*, 3rd ed., West Sussex, John Wiley & Sons, 2016, pp. 530-539

৪৪. Richard Stone, "Religious Leaders Oppose Patenting Genes and Animals", *Science*, Vol. 268, Issue 5214, 1995, p. 1126

৪৫. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, "জৈব-প্রযুক্তি প্রসঙ্গে নৈতিক বিতর্ক ও অন্তর্নিহিত যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা বিচার", *The Jahangirnagar Review*, Vol. XXVIII, Issue C, ২০১৭, পৃ. ১৫

৪৬. M. Kaiser, "Assessing Ethics and Animals Welfare in Animal Biotechnology for Farm Production", *Rev. Sci. Tech. off Intl Epiz*, Vol. 24, Issue 1, 2005, p. 77

৪৭. C.A.J. Coady, 'Playing God', J. Savulescu and N. Bostrom (eds.), *Human enhancement,* Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 155-180

৪৮. Y. H. M. Safian, "Islam and Biotechnology: With Special Reference to Genetically Modified Foods", A Program on "Science and Religion: Global Perspectives", Philadelphia, Metanexus Institute, 2005, p. 7

৪৯. 'বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তি কৃষিতে বিপ্লব', 2019, Retrieved August 28, 2020 from: https://moa.gov.bd/site/news/3c219733-4ffb-4c52-a80f714bd6233b3b/বায়োটেকনোলজি-বা-জৈব-প্রযুক্তি-কৃষিতে-বিপ্লব

৫০. 'Bangladesh: Bangladesh Legal Metrology Laws', July 20, 2021, Retrieved September 22, 2023 from: https://www.mondaq.com/food-and-drugs-law/1093086/bangladesh-legal-metrology-laws; 'Food safety body plans GMO labelling on products', *The Daily Star*, February 26, 2020, Retrieved: September 22, 2023 from: https://www.thedailystar.net/business/news/food-safety-body-plans-gmo-labelling-products-1873069

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯২১-১৯৭০: নারীর সাংগঠনিক কর্মপ্রয়াস

হোসনে আরা*

সারসংক্ষেপ

অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব-বাংলায় বিশেষত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতির দিকে দৃষ্টি দিলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীর এই সাফল্য ও অর্জন একদিনে সম্ভব হয়নি। নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে অনেক ত্যাগ-তীতিক্ষা এবং সংগ্রামী জীবনের কথকতার ইতিহাস রয়েছে। ব্রিটিশ-বিরোধী তথা স্বদেশী আন্দোলনে সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে নারীর সাংগঠনিক তৎপরতার বহির্প্রকাশ ঘটে। ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ আইন' এবং 'বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী' তৎপরতাসহ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি চেতনায় নবজাগরণের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। প্রবহমান সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক কর্ম ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিকাশমান জীবনের দিকে এগিয়ে যায় পূর্ববঙ্গের নারীগণ—একাধিক সাংস্কৃতিক-সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে 'দীপালি সংঘ', 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি', 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি', 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'বেগম ক্লাব', 'বুলবুল ললিত কলা একাডেমী', 'ছায়ানট'সহ অসংখ্য সংগঠন। এই সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠাকরণ ও এর কাজকে এগিয়ে নেবার জন্য নীলা নাগ, যুঁইফুল রায়, বেগম সুফিয়া কামালসহ একদল সাহসী মেধাবী নারী সম্পৃক্ত ছিলেন। কৃতবিদ্য নারীগণ তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং প্রাণান্তকর সাংগঠনিক যোগ্যতার বিনিময়ে পূর্ব-বাংলায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। 'পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯২১-১৯৭০: নারীর সাংগঠনিক তৎপরতা' শীর্ষক প্রবন্ধে নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারীপ্রগতি, নারীকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্ম ও উদ্যোগ বিষদভাবে উঠে এসেছে।

চাবি শব্দ: পূর্ব-বাংলা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, নারী, সংগঠন।

ভূমিকা

সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় পূর্ব-বাংলার নারীদের সাংগঠনিক কর্মপ্রয়াসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনের বাণী ও কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। ব্যক্তিক সংযোগের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলায় নারীদের সাংগঠনিক অভিযাত্রা শুরু হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সংগঠন একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল– এই প্রচেষ্টার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মপ্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত; কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমবেতভাবে নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ অনুশীলন, ত্যাগী মনোভাব, পরার্থপরতাবোধ, জ্ঞানানুশীলন, দেশপ্রেম-সঞ্জাত উন্নত জীবনবোধের আলোকে সমাজের মানুষের হিতসাধন তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণ-সাধনের জন্য কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই আদর্শ সংগঠনের মর্মার্থ নিহিত। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সংগঠন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজের বা রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসরত একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে যূথবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের কাঠামোগত-বিধিবদ্ধ জোটবদ্ধতাকেই সংগঠন বলে। এক্ষেত্রে ১৯২১ সালে পূর্ববঙ্গের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি মাইল ফলক হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব সেই সময়ের নারীদের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতার বীজ বুনে দেয়। এই সময়ের নারীদের চেতনার বিকাশ এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দির শুরুতে বঙ্গভূমি বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র রূপে পরিচিতি লাভ করে। বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শাসকের চক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠে একাধিক গুপ্ত সমিতি। এছাড়াও সমাজের নারীদের প্রতিষ্ঠাকল্পে লীলা নাগ এবং তাঁর ১২ জন সহযোদ্ধার সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দীপালি সংঘ'–যার মর্মমূলে ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা; আর এই কর্ম প্রবাহিত হয় নারীসমাজকে শিক্ষা, সমাজকর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে–দেশের উন্নয়ন সাধন ছিল তার প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। বাঙালি শিক্ষিত নারীসমাজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে স্বদেশপ্রেমে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হন, আর এক্ষেত্রে তাদের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন নারী সংগঠন। ১৯২৬ সালে নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন' (AIWC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন নারীদের আইনগত অধিকার, ভোটাধিকার ও নারীশিক্ষা প্রসারে কাজ করে। তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার নারীরা সমাজের কল্যাণমূলক কর্ম এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। এই সময়েই বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সারাসরি অংশগ্রহণ এবং সমাজ-সংশ্লিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়েই নারীর নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বিকশিত হয়। কালের পরিক্রমায় নারীর এই অর্জন সমাজের নানা স্তরে কাজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করে দেয়।

দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে বেগম সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী এবং যুঁইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম-সম্পাদক করে 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গড়ে ওঠে। এই সমিতি পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর আওতায় বেগম সুফিয়া কামাল ও লায়লা সামাদ গঠনমূলক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। এক্ষেত্রে পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব'-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সামাজিক কর্মের সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি-চর্চা করে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে 'বুলবুল ললিত কলা একাডেমী' পূর্ব-বাংলার শিক্ষা-সমাজ, সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি'র নাম

উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে সংস্কৃতিচিন্তা ও সমাজ ভাবনার ক্ষেত্রে 'ছায়ানট'-এর অবদান উল্লেখ করার মতো। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ছায়ানট'র কর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে নারীগণ বুদ্ধিবৃত্তিক-সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ পায়।

মূলত, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অধিক হারে নারীদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী দশক গুলোতে এই তৎপরতা চলমান থাকে। এক্ষেত্রে নারীগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক–প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকল্যাণ, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশায় তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯২১ থেকে শুরু করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কাল বিবেচনায় নারীর সাংগঠনিক তৎপরতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথমত, অবিভক্ত বাংলার নারী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর পাশাপাশি চরকায় সুতা কেটেছে, নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তঃপুরবাসিনী নারীরা ঘরের বাইরে এসে কাজ করার সাহস এবং শক্তি অর্জন করেছেন; যা তাদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীপ্রগতি এবং আধুনিকতার দিকে অগ্রসর করেছে। দ্বিতীয়ত, দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অনগ্রসর পূর্ববঙ্গীয় সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমান নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেদের সরব উপস্থিতি জানান দেন। বেগম সুফিয়া কামাল, নাদেরা বেগম, শামসুন্নাহার মাহমুদ, নূরজাহান মুরশিদ, মতিয়া চৌধুরী, মাহফুজা খাতুন, সন্‌জীদা খাতুন, আয়শা খানম, মালেকা বেগম, মমতাজ বেগম প্রমুখ নারীর সাহসী এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পূর্ব-বাংলার নারীসমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুবাদে পূর্ববঙ্গের নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক গুণাবলি প্রোথিত এবং বিকশিত হয়। কর্মমুখর নারীসমাজ রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করেন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ব-বাংলার নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয় ১৯০৫ সালের পর থেকেই। এই সময়কালে নারীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে 'ব্রত পালন', 'অরন্ধন', 'রাখী বন্ধন'–এই উৎসবগুলিতে দলে দলে নারীরা যোগ দেন।[১] শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণই নয়, এ সময়ে নারীরা বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে থাকেন। এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। বর্তমান গবেষণার সময়কাল ১৯২১-১৯৭০: ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে পূর্ব-বাংলার নারীরদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে যায়। এই গুরুত্বের বিচারে, অবিভক্ত বাংলায় নারীজাগরণের ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পারিবারিক-রাজনৈতিক-সামাজিক আবহ সংগ্রামী চেতনানির্ভর ও জনবান্ধব: 'দেশবন্ধুর প্রেরণায় উর্মিলা দেবী মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯২১ সালে তিনি 'নারী

কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল চরকা ও খদ্দর জনপ্রিয় করা এবং দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচার করা। সুনীতি দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি এই কর্মমন্দিরের উৎসাহী কর্মী ছিলেন।'[২] দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং ছোটবোন উর্মিলা দেবী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

১৯২১ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন লীলা নাগ। ১৯২৩ সালে ইংরেজী বিভাগ থেকে এমএ পাশ করেন। পূর্ব-বাংলার নারীপ্রগতি এবং নারীর রাজনৈতিক যোগসূত্রতার ক্ষেত্রে লীলা নাগ স্মরণযোগ্য নারী চরিত্র। উচ্চশিক্ষিত এবং প্রগতিশীল পরিবারে জন্ম নেওয়ার সুবাদে লীলা নাগ ছোটবেলা থেকেই স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সুপ্ত বাসনা লালন করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন; তাঁর এই সুপ্ত বাসনার প্রমাণ পাওয়া যায় পিতাকে লেখা পত্রের মাধ্যমে পিতার লিখিত পত্রের উত্তরে দৃঢ়চেতা নারীর স্বদেশচিন্তা মূর্ত হয়: 'পড়বো কি? পড়তে গেলেই নানা কথা (পরাধীন দেশের নানা দূরবস্থা) মনে হয়। ইচ্ছে করে পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়ে যা হয় একটা কিছু করি। এমনি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে আর থাকা যায় না।'[৩] রাউলাট আইন, জালিয়ান ওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকান্ড, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন তাঁর চিন্তা-চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, তাঁকে করে তুলেছে ব্রিটিশ বিরোধী। তাঁর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সময়েই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ও জারিকৃত নারীর জন্য অবমাননাকর নিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সংগঠিত করে আন্দোলন সংগ্রামে ব্রতী হন। মূলত, কলকাতার বেথুন কলেজে অধ্যায়নকালেই লীলা নাগের মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। ১৯১৭ সালের ২ অক্টোবর তাঁর সপ্তদশ জন্মদিন উপলক্ষ্যে পিতার উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে তিনি অকুতোভয় দেশপ্রেম, সাহসিকতা এবং বীরত্বব্যঞ্জক আশাবাদ ব্যক্ত করেন, 'আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকের উপকার করতে পারতো, তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি– এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা। এই আমার Ideal–আশীর্বাদ করো যদি এ জন্মে কিচ্ছু করতে না পারি, আবার যেন প্রিয় ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি। একে সেবা করে এ জন্মেও আশা মেটাতে।'[৪] –এই চিঠির মর্মার্থ অনুধাবনে আমরা সদ্যকৈশোর উত্তীর্ণ একজন নারীর দেশপ্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারি। দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে সমর্পণ করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখানে ফুটে উঠেছে তা তুলনারহিত। আর এ কারণেই পরবর্তীতে লীলা নাগ দেশমাতৃকার সেবায় আজীবন নিজেকে উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সুস্নাত দাস এ সম্পর্কে লিখেছেন:

> বাংলাদেশে অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে যে দু'চারজন সুশিক্ষিতা তরুণী বাংলার ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে প্রতিভাদীপ্ত ছিলেন এই লীলাবতী নাগ। ঢাকার একটি বিখ্যাত ধনী পরিবারের তরুণী কন্যাকে ১৯২১ সালে যখন নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'র সহ-সম্পাদক পদে গ্রহণ করা হয়।

> এই সময়েই কংগ্রেসের আহ্বান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২৩ সালে এমএ পাশ করার পর যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলনের রোমাঞ্চকর স্মৃতি ম্লান হয়ে আসছে, স্বরাজ হাতের মুঠোয় আসেনি, যখন শুধু 'চরকা কাটো' আর 'তাঁত বোনো' মন্ত্রে তরুণ-চিত্ত আর উদ্বুদ্ধ হয়না সেই সময়ে লীলাবতী নাগ বারোজন সঙ্গী নিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'দীপালি সংঘ'।[৫]

দীপালি সংঘের পরবর্তী কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব-বাংলায় নারীর স্বাধিকার আদায়ে সাংগঠনিক যোগ্যতার নিরিখে তিনি ও তাঁর কর্ম চিরভাস্বর।

১.

'দীপালি সংঘ' নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতির ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। ব্রিটিশ আমলে মহৎ কাজের দায়িত্ববোধ কাঁধে নিয়ে, সমাজ থেকে অন্ধকুসংস্কার দূর করার মানসে, জেল-জুলুম-হয়রানি সংক্রান্ত জীবনের অত্যাচারের তুচ্ছ জ্ঞান করে, ঝুঁকিপূর্ণ শাসকের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে লীলা নাগ তাঁর ১২ জন সহকর্মী নিয়ে দীপালি সংঘের যাত্রা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন, 'ঠাকুর পরিবারের এনা রায়, ঢাকার ব্যারিস্টার পি. কে বসুর কন্যাদ্বয় কমলা বসু, মনোরমা বসু। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য ডা. নেপাল রায়ের কন্যাদ্বয় লতিকা রায়, লীলা রায়। শ্রীহট্ট মুরারী চাঁদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র দত্তর কন্যা বীণা দত্ত এবং লীলা নাগের আজীবন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ অমলচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী শ্রীমতি সরোজ বসু।'[৬] লীলা নাগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান, ধর্ম ও কর্মে নারীর প্রতিষ্ঠা। তবে তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, 'সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ'।[৭] ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়াও এই সংগঠনের অন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তা নিম্নরূপ:

> (১) কুটির শিল্পশিক্ষা, কাপড় উৎপাদন, বাঁশ-বেতের ও সেলাইয়ের কাজ (২) স্বাস্থ্যশিক্ষা (৩) শিশুপালন ও পরিচর্যা (৪) স্টাডি সার্কেল গঠন ও পাঠাগার স্থাপন (৫) বয়স্ক শিক্ষা (৬) শিশুশিক্ষা (৭) আমোদ-প্রমোদ চিত্তবিনোদন (৮) খেলাধুলা (৯) ব্যায়ামশিক্ষা (১০) সঙ্গীতশিক্ষা (১১) অভিনয়।[৮]

লীলা নাগ দীপালি সংঘের মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। দীপালি সংঘের উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠনের শাখা গড়ে ওঠে এবং তারই পরিচালনায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘটি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের সমস্যাটি প্রবলভাবে তুলে ধরে তাদের কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। ঢাকায় মেয়েদের প্রথম বেসরকারি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে লীলা নাগ তার অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটিই 'দীপালি স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরই ধারাবহিকতায় তিনি নারীশিক্ষা মন্দির, শিক্ষা ভবন, শিক্ষায়তন নামে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি স্কুল পরবর্তী সময়ে 'কামরুন্নেসা স্কুল' নামে পরিচিত হয়। নারীশিক্ষা মন্দির ঢাকা শহরে অন্যতম একটি বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় বর্তমানে 'শেরে বাংলা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত।

লীলা নাগ তিরিশের দশকে বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারে সেদিনকার উদ্যম তাঁকে বাংলাদেশের নারীশিক্ষা বিস্তারে পথিকৃতের ভূমিকায় চিহ্নিত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের নারীরা যে পরাধীনতার বেড়াজালে বন্দী সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য লীলা নাগ দীপালি সংঘে পাঠাগার স্থাপন করেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশপ্রেম, সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্ম-উপলব্ধি বিকাশে সহায়তা করে এমন পুস্তকের সমাহার ছিল পাঠাগারে। তাছাড়া ছাত্রীদের স্ট্যাডি সার্কেল গঠন করে তিনি মাদারল্যান্ডের 'ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ' গ্রন্থটি পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মেয়েদের আবাসন ব্যবস্থায় যেন কোন সমস্য না হয়, সেজন্য তিনি ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলেন। হেয়ার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে লীলা নাগের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হয়। লীলা নাগের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়গুলো পর্যায়ক্রমে: দীপালি স্কুল (অভয় দাস লেন), নারী শিক্ষা মন্দির (টিকাটুলি), শিক্ষাভবন (বকশিবাজার), শিক্ষায়তন (কায়েতটুলী), বাংলাবজার বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি বারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও শহরের বিভিন্ন পাড়ায় গড়ে তোলেন। ঢাকা ছাড়াও সিলেট ও মানিকগঞ্জে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর স্ব-পল্লী পাঁচগাঁয়ে 'কুঞ্জলতা বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা শহরের বাইরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে মানিকগঞ্জে অনিল রায়ের সহযোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল ও একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।[৯]

লীলা নাগের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার 'দীপালি সংঘ' বিপ্লবী নারী জাগরণের ক্ষেত্রে সূতিকাগার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দির প্রথম দুই দশকে বাঙালি ছাত্রী তথা নারীশিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেমের যে অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এই শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে এসে তা প্রস্ফূটিত হয়। এই সময়েই গড়ে ওঠে বিভিন্ন নারী সংগঠন, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে নিষিদ্ধ লিফলেট, পুস্তিকার মাধ্যমে ক্রমশ বিপ্লবী ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ছিল, 'ছাত্রীসমাজের এই পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক চেতনা শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা, তাদের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও তা রূপায়িত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে 'দীপালি সংঘ'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[১০] মূলত, লীলা নাগ তৎকালীন সময়ে নিজের ভেতরের আলোকিত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, একটি শক্তিশালী পুরুষশাসিত সমাজে নারী অবহেলিত, অসংগঠিত ও নিষ্প্রভ। তথাপিও যুগ যুগ ধরে অদৃষ্টের কাছে নতজানু এই নারীসত্তার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে বিপুল উদ্দীপনা ও শক্তি; অথচ তাদের কেউ কাজে লাগাচ্ছে না। শুধু সন্তান ধারণ নয়, অমিত সম্ভাবনাময় নারীর চৈতন্য জাগ্রত করার মানসে তিনি কাজ করতে গিয়ে দেখেন যে, নারীরা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। সম্পূর্ণ অসংগঠিত ও নিদ্রিত নারীসত্তাকে জাতির মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করাই ছিল তার আসল ব্রত। এই উদ্দেশ্য

সাধনে ব্রতী হয়ে তিনি নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন: প্রথমত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্য শিল্প প্রদর্শনী করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হস্তশিল্প মেলার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অপরিচিত মুখগুলোকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা ও মিলন ঘটানো। দ্বিতীয়ত, মেয়েদেরকে স্বদেশি ভাবনায় স্কুলমুখীকরণ, স্বদেশী দ্রব্য তৈরি ও ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ এবং স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দক্ষ দেশকর্মী গড়ে তোলা। তৃতীয়ত, সবল মানসিক শক্তিধারায় মেয়েদেরকে নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা—পরে অনান্য বিপ্লবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক সম্মিলিতভাবে বৃটিশদের উপর দুর্বার গতিতে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ। মহিলাদের মানসিক সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে সাধারণ স্কুল, শিল্পস্কুল, খাদি প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থাপন। গ্রাম-শহরের ব্যবধান দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানত কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটানো। চতুর্থত, নিজস্ব ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সম্পদের আলোকে দেশের পুনর্গঠন কাজে প্রস্তুতি গ্রহণ। পঞ্চমত, উচ্চশিক্ষাস্তরে ব্যাপকভাবে নারীর প্রবেশ ঘটানো। এই লক্ষ্যে তিনি কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে একাধিক মহিলা হোস্টেল স্থাপন করেন। ষষ্ঠত, কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপত্তার চিন্তা মাথায় রেখে ঢাকা ও কলিকাতায় কর্মজীবী হোস্টেল স্থাপন করে রাজনৈতিক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটান। সপ্তমত, স্বাধীন মত প্রকাশ ও চেতনাকে সর্বস্তরের শিক্ষিত মহলে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সমস্ত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে একটি অবহেলিত সমাজের পুনর্গঠন কাজ ত্বরান্বিত হয়েছিল।[১১] বস্তুত, লীলা নাগ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যেমে ধাপে ধাপে নারীদেরকে তাঁর সমর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে দীপালি সংঘে যোগদানকৃত নারীগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। দীপালি সংঘের কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপিত নারীগণ তাঁদের আপন ঠিকানা খুঁজে পান। দীপালি সংঘ ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ঢাকার শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। লীলা নাগের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সক্রিয় সংগঠন ছিল এটি। এর মাধ্যমে মেয়েদের বিশেষত, নারীশিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং সমগ্র সমাজে দেশপ্রেমের নবচেতনার সঞ্চার হয়েছিল। বাংলার বহু জেলায় এই সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছিল। পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মধ্যেও লীলা নাগের কর্মতৎপরতা ছিল অসামান্য। তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'।

১৯২৬ সালে বিপ্লবী অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘ' (এটি ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ পন্থীদের একটি বিপ্লবী সংস্থা, যদিও প্রকাশ্যে সমাজ সেবাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য) এবং লীলা নাগ-এর 'দীপালি সংঘ' যুগপৎ সম্মিলনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'। লীলা নাগ এসময় অনুভব করলেন, নারী সমাজের মুক্তি জাতীয় মুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়, এবং রাষ্ট্রীয় মুক্তি ছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তির মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এ সময়ে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' শাখা গড়ে ওঠে বিভিন্ন জেলায়। ১৯২৮ সালে কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছাত্রী সংঘ'। লীলা নাগের পাশাপাশি অন্যান্য যে সকল নারী শিক্ষার্থী/নারী এই

সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন : কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য), সুরমা মিত্র, মমতা দাশগুপ্ত, লীলা রায় (মজুমদার) প্রমুখ। এছাড়াও কুমিল্লার প্রতিভা ভদ্র, পারুল মুখার্জি, শান্তি ঘোষ, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মা, বরিশালের শান্তি সুধা ঘোষ, অপরাজিতা ঘোষ প্রমুখ ছাত্রী নেত্রিরা ছিলেন সংগঠনের মুখ্য স্থপতি। এরা নানাভাবে হেমচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত গ্রুপের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিপ্লবী অনিল রায় ছিলেন 'ছাত্রী সংঘ'র প্রধান পরিচালক, একটি জনকল্যাণকামী সমাজসেবী সংগঠনরূপে গড়ে উঠলেও 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' শিক্ষিতা তরুণী তথা নারীশিক্ষার্থীদের মধ্যে গোপনে কাজ করতো বিপ্লবী নারীকর্মী সংগ্রহের তাগিদেই । নারীশিক্ষার্থীদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কাজও গোপনে চালিত হতো এই সংঘের মাধ্যেমে।[১২] লীলা নাগ এবং অনিল রায় ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে বিপ্লবী বাংলার তথা ভারতবর্ষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের উজার করে দিয়ে একাধিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণমূলক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠন সমূহের শিক্ষা ও নীতি ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২.

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC)-এর গঠন এবং কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, ১৯২৬ সালে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের মধ্যে যদিও শ্রমিক-কৃষক মেহনতী নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব ছিল না, তবুও সাধারণভাবে নারীর আইনগত অধিকার, নারীর ভোটাধিকার ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের কাজে এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল।[১৩] এছাড়া সারদা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিরোধী জনমত তৈরি, দেহ-ব্যবসা বিরোধী প্রচারণা, বস্তিজীবনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, পানি-পয়োনিষ্কাশনসহ মুক্ত আলো ও মুক্তবায়ু সেবনের মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যকর সুস্থ্যজীবনের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য কাজ করেন। নারীর সুস্থ্যজীবনের জন্য ব্যায়াম, কর্মের জন্য সূচিকর্ম ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন নেতৃবৃন্দ। নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সুদূর প্রসারী কর্মের আলো এসে ঠিকরে পড়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা-মহকুমা-বিভাগীয় পর্যায়ে। তারই ধারাক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলন' এবং 'বগুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্য অনুষ্ঠিত এই সকল সম্মেলনের ফলে নারীমুক্তি, নারী-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক জাগরণ ঘটে নারী সমাজে– সর্বত্রগ্রামী এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয় এই সমস্ত কর্মকান্ড।[১৪] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার নারীরা সমাজের কল্যাণমূলক কার্য এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। এই সময়েই বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সমাজ-সংশ্লিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগের মধ্যে দিয়েই নারীর নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বিকশিত হয়। কালের পরিক্রমায় নারীর এই অর্জন সমাজের নানাস্তরে কাজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করে দেয়। দলমত নির্বিশেষে

সকল শ্রেণীর নারীদের সম্পৃক্ততায় প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন। ছাত্রীরা যেমন ছিলেন এ আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি, ঠিক তেমনিভাবে কমিউনিস্ট নারীরাও এর সাথে যুক্ত থাকেন। এসময়ে নারীগণ সমাজের গণ-সংগঠনরুপে কাজ করতে থাকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে। নারীর ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যমুখি চেতনা সমাজের সর্বস্তরের নারীদের মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধ ও ধর্মসম্পৃক্তির ফলে সমভাবে গৃহীত না হলেও নারী জাগরণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ মাইল স্টোন হিসাবে স্বীকৃত।[১৫] নারীর নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা বিচারের নিরিখে আশালতা সেন বিশেষভাবে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিক্ষিত পারিবারিক আবহে গড়ে ওঠা আশলতা সেন নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে থাকেন। তিনি ঢাকার গেন্ডারিয়ায় বসবাস করতেন। নারীদেরকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করার মানসে এবং গান্ধীর মহৎ বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে তিনি সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তার সহযোগিতায় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন। সমিতির সদস্যগণ খদ্দরের বিক্রি সংক্রান্ত প্রচারকার্য চালাতেন–শহরে এবং বিভিন্ন জেলায়। গান্ধীজির অহিংস বাণী, মহামতি গৌতম বুদ্ধের সর্বমানবীয় কল্যাণবোধ সংক্রান্ত বাণীর ব্যানারসহ উজ্জীবনী শক্তির আলোকে নারী জাগরণের অভীপ্সায় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি'র বাৎসরিক শিল্প মেলায় একটি গান্ধীমন্দির স্থাপন করে মহামতি গৌতম বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত মূর্তি ও ছবি রাখার ব্যবস্থা করতেন:

> কিভাবে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার বাণী গান্ধীজির ভিতর দিয়ে বর্তমান যুগে নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে সম্বন্ধে মেলায় সমবেত লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া হত। এই 'গান্ধীমন্ডপ'টি সকলের নিকট সকলের নিকট একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।
>
> ১৯২৪ সালে আশলতা সেন নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের (A.I.S.A) সদস্য হন এবং ব্যাপকভাবে খদ্দর-প্রচারে ব্রতী হন।
>
> ১৯২৭ সালে ঢাকায় মহিলা কর্মী তৈরি করার জন্য তিনি 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করেন। আশ্রম-গঠনে তাঁর শ্বশুর এবং 'বিদ্যাশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই উভয়ের নিকট থেকে তিনি সহায়তা পান।[১৬]

এছাড়াও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় 'জুড়ান শিক্ষামন্দির' এবং ১৯৩০ সালে 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' গঠন করেন। তাঁরা সংগঠিত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। নারীর রাজনৈতিক কর্ম-পরিকল্পনার জন্য তিনি ১৯৩১ সালে 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' গঠন করেন। শিক্ষাবিস্তার এবং নারী-নেতৃত্ব এই উভয়বিধ যোগ্যতা অর্জনের জন্য আশালতা সেন ঢাকায় 'নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করেন। শিক্ষাদানের জন্য মানভূমের কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত নিয়োজিত হন। এই শিক্ষা শিবিরে এসে ঢাকা ও বিক্রমপুরের প্রায় ৫০ জন কর্মী শিক্ষাগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সিলেটের ৪ জন নারীশিক্ষার্থীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] সিলেটের নারীশিক্ষা ও নারী-রাজনৈতিক নেতৃত্বের বেলায় আরেক দেশপ্রেমিক তেজস্বী নারীনেত্রী

জোবেদা খাতুনের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সভাসমিতিতে তাঁর উপস্থিতির স্বাক্ষর রাখেন:

> ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের আহ্বানে ও উদ্যোগে সারা বাংলায় ব্যাপক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব আন্দোলনের মধ্যে ছিল আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ আইন ভঙ্গ করা, বিদেশি জিনিস বর্জন ইত্যাদি। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে কটি আন্দোলন চালানো হয়েছে তার প্রতিটিতে ছিল জোবেদার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। এসময়ে তাঁর বাড়িতে চরকা কাটা হত এবং তিনি নিজে খদ্দর পরতে শুরু করেন। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনের স্বপক্ষে তিনি পিকেটিং ও মিছিলে যোগ দেন।[১৮]

নিষেধের বেড়াজাল পায়ে ঠেলা অগ্রণী নারীদের মধ্যে আরেকজন লাবণ্যলতা চন্দ; পারিবারিক মানবকল্যাণমূলক কাজের মননশীলতায় গড়ে ওঠা ময়মনসিংহের মেয়ে, যিনি কার্যব্যাপদেশে কুমিল্লায় 'ফয়জুন্নেছা গার্লস স্কুলের' প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন নারীশিক্ষায় মনোযোগী হন। সাংগঠনিক কার্যক্রম স্বতঃস্ফূর্থভাবে চালানোর নিমিত্তে তিনি সরকারি হাই স্কুলের চাকুরি ত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান 'অভয় আশ্রম'-এ কাজ করতে থাকেন : 'গ্রাম ভিত্তিক কুটির শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভতার জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন কংগ্রেস নেতারা। বৃটিশদের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন, চরকা কাটা ও খদ্দর আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিলো 'অভয় আশ্রম-এর বিপ্লবীদের কাজ।'[১৯] 'অভয় আশ্রম'-এর প্রভাবে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লায় 'কন্যা-শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন ক্ষণপ্রভা সিংহ – এই দুই মহীয়সী নারীর সাংগঠনিক-প্রশাসনিক অগ্রগামী দক্ষতা ও যোগ্যাতার হাত ধরেই কন্যা-শিক্ষালয়, এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৩২ সালের 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এ তিনি যোগদান করেন। তার হাত ধরে কন্যা-শিক্ষালয়ের সকল কর্মীই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সরকার বিক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষালয়টি বন্ধ করে দেন, বেআইনী ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দায়ে ব্রিটিশ সরকার লাবণ্যলতা চন্দসহ শান্তশীল পালিত, সরযু বসু, নবনীতা কোমলা সিংহ, গিরিবালা ঘোষ, বিভা গুপ্ত, বিয়দা দত্ত প্রমুখকে ৬ মাস থেকে ১ বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন। কিন্তু লাবণ্যলতা চন্দ দমে যাবার পাত্রী নন; তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েই পুনরায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন; তারই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আবার ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন সরকার। তাঁর সঙ্গীসাথীরা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই আবার তার সাথে যোগ দিয়ে সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর রাখেন।[২০]

নারীশিক্ষা, নারীকর্ম ও নারী প্রগতির ক্ষেত্রে কুমিল্লার পাশাপাশি সিলেটের যোগসূত্র নিবিড়। চরকায় সুতাকাটা, খদ্দর বোনা, নারীস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিস্তারে সিলেটের সরলবালা দেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। ১৯৩১ সালে তিনি সিলেটে 'নারীকর্মী শিক্ষায়তন' প্রতিষ্ঠা করেন। সরলবালা দেবের কর্মদক্ষতায় শতশত নারীকর্মী ও সংগ্রামী গড়ে ওঠে। ১৯৩২ সালে বিলাতী কাপড় পরিহারের নিমিত্তে গড়ে ওঠা আন্দোলনে এই সকল নারীকর্মীদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়: '১৯৩২ সালের আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে সরলবালা দেব দেড়বৎসর সশ্রম

কারাদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। অন্যান্য বহু মহিলা কর্মী কারারুদ্ধ ছিল।'[২১] ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন দৌলতুন্নেসা খাতুন, তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'গাইবান্ধা মহিলা-সমিতি' গঠন করেন। এ সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন মহামায়া ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন দৌলতুন্নেসা খাতুন এবং সহ-সভানেত্রী দক্ষবারা দাস। এই সমিতি সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচারকার্য ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যেমে গাইবান্ধায় ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যক্রম চালাতে থাকে।[২২] বয়সে নবীন হলেও এই সংগঠনের কর্মীরা গাইবান্ধার আশেপাশের ৭/৮ টি গ্রামের মহিলাদেরও সম্পৃক্ত করেন। দৌলতুন্নেসা খাতুন বাজুন ঘর-ডাঙ্গা, সুরতখালি, নলডাঙ্গা, বিজয়ডাঙ্গা, ফুলছড়ি, কৃপতলা, তুলসীঘাট প্রভৃতি গ্রামে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বহুলোকের সমাগম হত। ঘোর পর্দানশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়ে তাতে আবার অত ছোট, তাই সভা লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। দৌলতুন্নেসা খাতুন প্রাণের আবেগে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বন জানাতেন। তাঁর এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বামীকে সরকার গাইবান্ধা থেকে বহিস্কার করে এবং গাইবান্ধার বাড়িও বাজেয়াপ্ত করে। এমতাবস্থায় ঘরহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায়ও তিনি আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। অতঃপর পুলিশ ফুলছড়ি গ্রাম থেকে মহামায়া ভট্টাচার্য, প্রতিভা সরকার দৌলতুন্নেসা খাতুনকে গ্রেপ্তার করে।[২৩] কিন্তু গাইবান্ধা মহিলা সমিতির মাধ্যামে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নারীদের আন্দোলন সম্পৃক্ত করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নতুন যাত্রা যোগ হয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্বে বাংলায় নারীদের সংগঠিত করতে সবচাইতে কার্যকর সমিতি হিসাবে অত্মপ্রকাশ করেছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ তথা বাংলায় জাপানী আক্রমণের ফলে জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এর সাথে যুক্ত হয় খাদ্যাভাব। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারীরা জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়। এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা – মূলত, কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন হিসাবে এ সংগঠন সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কনক মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'এই সভায় বামপন্থী পার্টির মহিলারা ছাড়াও বিভিন্ন দলমতের ও নির্দলীয় প্রগতিশীল মহিলারা যোগদান করেন।'[২৪] ১৯৪২ সালের ২২ জুন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানী বোমা হামলা এবং যুদ্ধজাত বিভিন্ন সংকটের হাত থেকে আত্মরক্ষমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ করে, নারী সমাজকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ফ্রন্ট হিসাবে বাংলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়েছিল। নারীর সার্বিক মঙ্গল বিধানের লক্ষ্যেই জনমত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নারীকে এ পার্টির অধীনে সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মহিলারা এগিয়ে আসেন। তাঁরা সংগঠিতভাবে দেশরক্ষার জন্য ফ্যাসিবিরোধী প্রচার আন্দোলনের কাজে ও দুঃস্থ জনগণের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাড়ায় পাড়ায়

মহিলাদের উদ্যোগে গড়ে উঠতে থাকে আত্মরক্ষা কমিটি, রিলিফ কমিটি, জনরক্ষা কমিটি এবং সংযুক্ত ফুড কমিটিগুলো; তাতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে থাকেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রক্ষণশীল ঘরের মেয়েরাও এই জনজোয়ারের মধ্যে এসে যায়। মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির আঘাতে ভাঙতে থাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বাধানিষেধ। অন্তঃপুরের মেয়েরাও বোরখা ছেড়ে, ঘোমটা ফেলে জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখিন হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান।[২৫] পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নেয়াখালী, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালায়। তার বাস্তবচিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় *জনযুদ্ধ* নামক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে, 'দিনাজপুর: গত ১০ মে ফুলবাড়ি থানার লালপুর ডাঙ্গায় হারুনা বিবির সভানেতৃত্বে কৃষক মেয়েদের একটি সভা হয়। সভায় ২০০ কৃষক মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিখ্যাত মহিলা নেতৃ কমরেড আশা চক্রবর্তী জাপানীদের রুখিবার জন্য কৃষক মেয়েদের একজোট হইতে বলেন। একটি কৃষক মেয়েবাহিনী গঠন করা হয়। কৃষক মেয়েদের ভিতর বিপুল সাড়া পরিয়া গিয়াছে।'[২৬] 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র দেশব্যাপী কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা যায় এভাবে: ময়মনসিংহ জেলায়, ১৯৪২ সালের ১ জুন শেরপুর শহরে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী মনি কুন্তলা সেনের নেতৃত্বে একটি মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চারশত হিন্দু-মুসলমান মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় প্রাথমিক চিকিৎসা, শিক্ষা, লাঠিছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং একটি নারী-আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয়। দিনাজপুর: শ্রীযুক্তা সুরবালা সেনের সভানেতৃত্বে ১৯৪২ সালের ৩ জুন রামভদ্রপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কুমারী ধানাপানি দে ও শান্তি সেন চীন ও সোভিয়েত নারীর আদর্শ, ভারতীয় নারীর কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভা শেষে স্থানীয় মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এর আগে ২৪ মে পটুয়াখালী শহরে কমরেড যুঁইফুল বসুর নেতৃত্বে একটি ফ্যাসিবিরোধী মহিলা সম্মেলন হয়। যেখানে প্রায় ৩০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এখানে সবাই ফ্যাসিস্টদের রুখে দেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। চট্টগ্রাম: ১৯৪১ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রাম জেলায় নারী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন পাড়ায় পাঠচক্র চালানো, প্রতি ১৫ দিনে বিভিন্ন পাড়া কমিটিতে শিল্পকার্য শিক্ষা দেওয়া, পাড়া কমিটির বৈঠকে সপ্তাহে একদিন শিশুপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক বুৎপত্তি অর্জন। এই সমিতি নয়াপাড়া কদুরখীল, ধলঘট, ছনহারা, সাতকানিয়া, ফতেয়াবাদ, বরসা প্রভৃতি গ্রামে নারী কর্মদল গঠন করে জাপানবিরোধী প্রচার, স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন, জনরক্ষা ফান্ডে অর্থ সংগ্রহণ ইত্যাদি কাজ নিপুণভাবে পরিচালনা করে। রংপুর বদরগঞ্জের নারীকর্মীদের তৎপরতায় ১৭ জুলাই একটি নারীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় দেড়শতাধিক মেয়ে উপস্থিত ছিল। শ্রীমতী সুশীলা রায়, রেখা রায়, সরলা রায় ও লিলি কুণ্ডু পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মেয়েদের কর্তব্য, নারী-আত্মরক্ষা সমিতি ও বন্দীমুক্তি সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা করেন। এমনকি বন্দীমুক্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহেও তারা

উদ্যোগী হয়েছিলেন। বৃহত্তর খুলনার সাতক্ষীরার রসুলপুরে নারীদের বিশেষত, মুসলিম নারীদের ভিতরে যথেষ্ট চেতনা দেখা দেয় এবং তারা সংঘবদ্ধ হয়; এখানে একটি নারী-আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। যার সম্পাদিকা ছিলেন তসলিমা খাতুন। বরিশালে শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাসের নেতৃত্বে ১৬ জুন স্থানীয় টাউনহলে বরিশালের বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্নেহলতা দাসকে সভানেত্রী, শান্তিসুধা ঘোষ এবং যুঁইফুল বসুকে যুগ্ম-সম্পাদিকা করে ১৭ জন মহিলা নিয়ে একটি আত্মরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা এ কমিটিতে যোগ দেন। শহরের ৬টি কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ও চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক মাসের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষায় ১২ জন ছাত্রী পাশ করে। গৈলা, পটুয়াখালী, বাউকাঠি, কীর্তিপাশা, রূপসী, কেওড়া প্রভৃতি স্থানে আত্মরক্ষা কমিটির কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গৈলাতে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা যোগ দেয়। আত্মরক্ষা কমিটিগুলো রাজনৈতিক আলোচনা ও পাঠচক্রের বন্দোবস্তও করে। এছাড়াও ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জে আত্মরক্ষা সমিতির কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়; ১৯৪২ সালের ২৮ আগস্ট মুন্সিগঞ্জে মহিলাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সমকালীন সংকটময় পরিস্থিতি ও নারীদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করাসহ জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নানবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজ যেমন: সূচিশিক্ষা, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির গন্ডিবদ্ধ ও নিয়মনীতিবদ্ধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মহিলা শাখা গঠন করাসহ টুকটাক কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এসব সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সরকারি দলের ও বিত্তবানদের পরিবারের নারী সদস্যগণ। এরা সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; যদিও এরা শিক্ষা-চিকিৎসা-নার্সিং-চরকায় সূতাকাটা-দুর্গতদের সাহায্য করার কাজ করতেন। নেতৃত্বের বেলায় সমাজের উপরি কাঠামোস্তরের হিসাব-নিকাশ থাকার জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে তাদের অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।[২৭] তবে এই সংগঠন সৃষ্টির নেপথ্য-কাহিনী ও প্রণোদনা ছিলো ইতিবাচক। নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেগম রানা লিয়াকত আলী খান প্রতিনিধিত্বশীল ১০০ জন মহিলার এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় 'আপওয়া' মহিলা সংগঠন।'[২৮] পূর্ববঙ্গেও 'আপওয়া' শাখার উদ্বোধন করেন বেগম আলী খান। 'আপওয়া' পূর্ব বঙ্গ শাখার প্রথম সভানেত্রী বেগম নূরুল আমিন খান এবং সহ-সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। পরবর্তীকালে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে পূর্ববাংলার 'আপওয়া'র কার্যক্রম এগিয়ে যেতে থাকে। অভিজ্ঞতার বলেই পাকিস্তান সরকারের মুসলিম ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে নারীসমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই স্বাধীনতার বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় পূর্ববঙ্গে একাধিক মহিলা সেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। দেশভাগের পর বেগম সুফিয়া কামাল ঢাকায় এসে লীলা নাগসহ মিসেস মোতাহার হোসেন, মিসেস মানিক ঘোষ, রহিমুন্নেসা, মিসেস রশিদ, মিসেস বেগম ঢাকা শহরের অলি-গলি ঘুরে সদস্য সংগ্রহ করে 'মহিলা সমিতি'

গড়ে তোলেন।[২৯] সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ 'আত্মরক্ষা সমিতি'র অসমাপ্ত কার্যাবলী এগিয়ে নেবার জন্য অনেক সদস্যই হতাশ হয়ে পড়েন; তবে কেউ কেউ সরকারি মহিলা সমিতি 'আপওয়া'য় যোগ দিয়ে অসমাপ্ত কল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ ঘটানোর লক্ষ্যে মেধা-শ্রম নিয়োগ করেন: 'ব্যাপক না হলেও কিছু কিছু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার কারণে সরকারি সংগঠনের মহিলারা ত্রাণ ও পুর্নবাসনমূলক সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং লীগ সরকারও সে কাজে উৎসাহ দেয়।'[৩০]

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে পূর্ব-বাংলায় সকল শ্রেণির নারীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। এই পরিষদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল নারীশিক্ষার্থীরা। এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, এবং আহ্বায়ক ছিলেন মালেকা বেগম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেত্রীসহ সাধারণ গৃহবধূ ও সমাজসেবী শিক্ষার্থীদের সম্মিলনের মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করাই এর প্রধান লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নারী নেতৃবৃন্দ ছিলেন বদরুন্নেসা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলী, রাজিয়া বানু, আয়শা খানম, ফাওজিয়া মোসলেম, মখদুমা নার্গিস, কাজী মমতা হেনা, মুন্নিরা আক্তার প্রমুখ।[৩১] গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নারীরা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে একটি স্থায়ী নারী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির দায়িত্ব পান সর্বজন শ্রদ্ধেয় বেগম সুফিয়া কামাল এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মালেকা বেগম। এছাড়াও যে সকল নারী নেতৃত্ব এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বেগম আবুল হাশিম, রইসা হারুন, আনোয়ারা বাহার, আমেনা আহমেদ, সারা আলী হামিদা হোসেন, নূরজাহান বেগম, নূরজাহান কাদের, রেবেকা মহিউদ্দিন, হুরমতন্নেসা মওদুদ, আজীজা ইদ্রিস প্রমুখ।[৩২] পরবর্তীকালে প্রতিটা আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

৩.

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও নারীর সাংগঠনিক তৎপরতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবন-কর্ম-চিন্তনের যূথবদ্ধ প্রয়াসই সংস্কৃতির মূলকথা: 'সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ, বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা'[৩৩] সংস্কৃতি বা Culture'– এই শব্দটির মাহাত্ম্য নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে; অমীমাংসিত, বিতর্কিত কিন্তু জীবন-জগৎ-সম্পর্কিত সমাজসিদ্ধ এই প্রয়োজনীয়-অবিচ্ছিন্ন শব্দটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একদিকে যেমন চলছে, তেমনি এর অন্তর্নিহিত সারবত্তা নিয়ে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে – পৃথিবীর আলোজল-

পুষ্পপল্লব-নদী-নালা-হাওর-সাগরের উপর নির্ভর করে কিংবা বশ মানিয়ে কিংবা কাজে লাগিয়ে কিংবা ধ্বংস ও বিনাশ করে সংস্কৃতি কিংবা কালচার-এর সঙ্গে আমাদের জীবন ও রাজনীতি, সৃষ্টি ও সংগ্রামের যোগসূত্র নিবিড়। সেই নিবিড় ও গভীর সংযোগের উপর দাঁড়িয়ে; সভ্যতার সংকট ও সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে, বিশ্বমানবতার কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-রাজনীতিবিদগণ – বিশেষত, সমাজ ও জীবনসংশ্লিষ্ট মানবকল্যাণকামী কর্মীগণ তাঁরা যে-যার অবস্থান থেকে পৃথিবীর মানুষের উন্নয়ন-কল্যাণ-সহাবস্থান প্রত্যাশা করেছেন; তারই বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁদের কর্মে-লেখায়-বিভায়-বৈদগ্ধ্যের আলোয়। Culture-কে কৃষ্টি অর্থে ব্যবহারের বেলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতি' হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন; তিনি কৃষ্টির সঙ্গে মানব-সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল জ্ঞানোদ্দীপ্ত প্রাকাশকে মেনে না নিয়ে, ধীরে ধীরে তিনিই প্রথম 'সংস্কৃতি' কথাটিকে Culture'-অর্থে বাংলায় চালু করেন (১৮৬১-১৯৪১) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় ১৯২০-এর দশকে।[৩৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল হালদার, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরীসহ কবি-সাহিত্যিক-ভাবুক-চিন্তকগণ ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেছেন: 'বলাবাহুল্য, ধর্ম-কর্মও এক রকমের সংস্কৃতি চর্চা, এতে মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে এর জন্য চাই আন্তরিকতা।'[৩৫] ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নত জীবন সম্বন্ধে চেতনা– সৌন্দর্য আনন্দ ও প্রেম সম্পর্কে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মের মারফতই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।'[৩৬] সংস্কৃতি একটি বৃহৎ ও ব্যাপক ধারণা, এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত জীবন ও সমাজের কর্ম ও কলাকৈবল্যবাদের, কানুন ও আইনের, ধর্ম ও রাজনীতির; অর্থাৎ, বিকাশমান জীবনব্যবস্থার সাথে ধর্ম ও সমাজসম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে কল্যাণকর পথপরিক্রমণের নামই সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি, বিশ্ব সংস্কৃতি নানাবিধ ভাগ-উপবিভাগ রয়েছে; সর্বোপরি মানবিক ও কল্যাণকর সংস্কৃতির চর্চাই আমাদের আরাধ্য। এই আরাধনা ও সহনশীলতার পথ ধরেই আমাদের বাঙালি সমাজ এগিয়ে চলছে। আমাদের ভারতীয় ভূ-ভাগের স্বাধীনতা, আমাদের দেশভাগকেন্দ্রিক জটিলতাসহ বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সকল ক্ষেত্রেই– আন্দোলন-সংগ্রাম, বিপ্লব-ভাষাবিপ্লব সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃতিকর্মী তথা সাংস্কৃতিক সংগঠন তথা সাংস্কৃতিক সংগঠনকেন্দ্রিক নারীনেতৃত্ব ও নারীসংগঠনের অবদান অনস্বীকার্য; বিশেষত, নারীর সাংগঠনিক তৎপরতা খুঁজে দেখার আলোকে বলায় যায় যে, ১৯২১-১৯৭১ কালপর্বে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, পাকিস্তান লেখক সংঘ, বুলবুল ললিত কলা একাডেমী, ছায়ানট, বেগম ক্লাব, নজরুল একাডেমী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক আরও কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি সংসদ, ড্রামা সার্কল, ছাত্র-শিক্ষক

নাট্যগোষ্ঠী, ডাকসু নাট্যদল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, প্রগতি মজলিস, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় ও করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী। উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোর সক্রিয়তা পূর্ব-বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিকশিত করেছে। এছাড়াও মক্তিযুদ্ধকালে গড়ে উঠেছে একাধিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। উল্লেখযোগ্য ফ্রন্টগুলো হল: বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী ও গোষ্ঠী প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল।[৩৭] সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীদের অবদান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ (১৯৫১)-এর নেপথ্যে সাহিত্য পত্রিকার সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী সম্পাদিত 'সীমান্ত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। এই নবনাট্য সংঘে শিখা রানী গুহ, মায়া চক্রবর্তী, চিন্ময় দাশ, মনি ইমাম, মীরা সেন, যুথিকা পাড়িয়াল, ইভা আলম, সালেহা আহমদ, জাহানারা জুবলী, শেফালী ঘোষ প্রমুখ সংস্কৃতি কর্মীগণ তাদের কর্মমাধুর্যে পূর্ব-বাংলার নারীর সাংগঠনিক যোগ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২)' তাদের সৃজনশীল কর্মের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। 'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে নারীর শৈল্পিক-সাংগঠনিক যোগ্যতা বিকশিত হয়। লায়লা সামাদের পরিচালনায় মঞ্চস্থ নৃত্যনাট্যটি খুব প্রশংশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪ সালের ১৬ এপ্রিল 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকার সংবাদটি এরকম:

> নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজধানীর নাগরিকগণ এবারকার নববর্ষ পালনে যতগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এবং স্থানীয় মাহবুব আলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[৩৮]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদকে বেশিদিন টিকতে দেয়নি সরকার। অনেক কর্মীরা সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বামধারার প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন বলেই তাদের উপর সরকারি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। এই সংগঠনের স্থায়িত্ব বেশিদিন না হলেও পরবর্তীকালে এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, হোসনে আরা, লায়লা সামাদ প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য।[৩৯] প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতায়, ভাষা-সংস্কৃতি চেতনাকে শাণিত করার মানসে ১৯৫২ সালে 'প্রগতি মজলিস' নামে প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজিত নাথ নন্দীর সভাপতিত্বে গঠিত এই সংগঠনের উদ্যোগে কুমিল্লায় পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা, ছালেহা খাতুন প্রমুখ। নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে

যেতে থাকে কর্ম; প্রকাশিত হতে থাকে নারীর সাংগঠনিক দক্ষতা, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৪ সালে কুমিল্লায় একাগ্রচিত্তে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের মধ্য দিয়ে। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগষ্ট কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠানে ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি রেভোলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কুমিল্লা শাখা সমূহ সহযোগিতা করেছিল।[৪০] পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর সাংগঠনিক তৎপরতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'বেগম ক্লাব (১৯৫৪)'-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্লাব পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে। দেশভাগের ফলে, কলকাতা থেকে ঢাকায় আসা নারীগণ এবং এদেশীয় শিক্ষিত সৃষ্টিশীল বিদ্বজ্জনের সম্মিলিত প্রয়াসেই এই সংগঠন নারীর সৃষ্টিশীলতা ও নেতৃত্ব বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে নূরজাহান বেগমের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> বেগম এর সেবাব্রতকে আরও সুদূরপ্রসারী করার জন্যে, সাপ্তাহিক 'বেগম'-এর লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য সাহিত্যিকের সমবায়ে একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ চালানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবাদি উদ্‌যাপন করতে পারবো, অপরদিকে তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথাও সংঘবদ্ধভাবে চিন্তা করতে পারবো। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে।[৪১]

দেশের নারী সমাজসেবী-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মতবিনিময় এবং ভাবের আদান-প্রদান করা তথা নারীপ্রগতি ও নারীর মর্যাদা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্মিলিত কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বেগম ক্লাব যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে – মত ও পথের দিশা খুঁজে পেতে বেগম ক্লাবের ভূমিকা অপরীসীম। বেগম ক্লাবের সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপ: 'বেগম ক্লাবের প্রাথমিক সদস্যবৃন্দ ছিলেন বেগম সামসুন নাহার মাহমুদ (সভাপতি), নূরজাহান বেগম (সাধারণ সম্পাদক), বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম মীজানুর রহমান, ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হামিদা খানম, মহসীনা আলী, সাইদা খানম, কবি হোসনে আরা মোদাব্বের, হুসনা বানু খানম, লুলু বিলকিস বানু, মালেকা পারভীন বানু, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সারা তৈফুর জাকিয়া রশীদ, মাজেদা খাতুন, সারা খাতুন, বেগম আব্বাস উদ্দীন আহমেদ, জাহানারা আরজু, মিসেস এস.এ. মজিদ, মোমতাজ বেগম বি-এ, মিসেস শাহজাদী বেগম, বেগম রোকেয়া, আলী রেজা, মিসেস মাজেদা আলী, মিসেস সুফিয়া রহমান, লায়লা সামাদ, মিস লিলি খান, বেগম আফিফা হক, মিসেস সুফিয়া খানম, মিসেস খাতুন সুফিয়া, বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমদ, মিসেস সালেহা খান, মিসেস এন মজিদ, মিসেস সালমা রহমান প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪২] সমাজের জাগরণ ও নারী প্রগতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে বেগম ক্লাবের পাশাপাশি 'বুলবুল ললিত কলা একাডেমী'র কার্যকলাপ নন্দিত। ১৯৫৫ সালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতিবিজড়িত এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি সংস্কৃতি-চর্চা কেন্দ্র, নাট্যকলা, চারু ও

কারুশিল্প বিষয়ক শিক্ষাদান ও শিল্প-সাহিত্য-সংগীত গবেষণা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে মাহমুদ নূরুল হুদার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। সেই সময়ের সংস্কৃতিকর্মী এবং শিক্ষিত পরিমার্জিত রুচিশীল রাজনৈতিক নারীগণ এই একাডেমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অনেকেই ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অনুসন্ধানে এবং গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ব-বাংলার অর্জন, ঐতিহ্য, ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনমানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বুলবুল ললিত কলা একাডেমির নারীকর্মীদের একনিষ্ঠ সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।[৪৩] পাকিস্তান পর্বে নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতি– বিশেষত, নারীর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে তুলে ধরার নিমিত্তে বুলবুল ললিত কলা একাডেমির পরে যে সংগঠনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে সেটি 'ছায়ানট'। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরার নিমিত্তে ১৯৬১ সালে 'ছায়ানট' আত্মপ্রকাশ করে। 'ছায়ানট' আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন বেগম সুফিয়া কামাল। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ফরিদা হাসান। নারীদের মধ্যে যাঁরা এই সংগঠনের শুরু থেকে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে শামসুন্নাহার রহমান, সন্‌জীদা খাতুন, সায়েরা মহিউদ্দীন, হোসেনে আরা, রোকেয়া রহমান কবীর, নূরুন্নাহার আবেদিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪৪]

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা বিচারের নিরিখে ছায়ানটের দান অপরিসীম। মননশীল এবং সৃজনশীল বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনকল্পে ছায়ানট বহুমাত্রিক শিল্পচেতনামূলক কৃতকর্মের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। বিকশিত সংস্কৃতিসেবীগণ তাদের কর্ম ও শিল্পসৌকর্যে সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগানোর চেষ্টা করছে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক অনুশীল ও চর্চার ক্ষেত্রে তারা রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুল ইসলামের গানসহ পঞ্চকবির অবদানকে তুলে ধরার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে সুস্থ, পরিশীলিত জীবনবোধ সম্পৃক্ত সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে 'ছায়নট' তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিল্পব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছায়ানটের উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত ছিলেন, আছেন। প্রয়াত ওয়াহিদুল হক কর্তৃক সৃজিত ও অনুপ্রাণিত শিল্পব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পর সংস্কৃতি কর্মীগণ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার যে তাগিদ অনুভব করেন সেই তাগিদেরই ফল 'ছায়ানট'। মোখলেছুর রহমান, আহমেদুর রহমান, সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক, সুফিয়া কামাল, সাইদুল হাসান, ফরিদা হাসান, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ এই সংগঠনের প্রাথমিক উদ্‌গাতা।[৪৫] ছায়ানটের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পাকিস্তানী সরকার একাধিকবার জাগরণ, আন্দোলন, সংগ্রাম ইত্যাদির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাঁধা প্রদান করে; সেক্ষেত্রে ছায়ানট বিদ্যায়তনকে একাধিকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। নজরুল-রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি ছায়ানট বর্তমানে ভাষা-সংস্কৃতি-চেতনাভিত্তিক স্কুল পরিচালনা করছে : 'এই

সংগঠন পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষণ, পরিবেশন এবং প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। সেই কারণেই বর্তমানে বাংলাদেশে সুস্থ সংগীত চর্চার দিকদর্শী প্রতিষ্ঠানরূপে ছায়ানট তার পরিচিতি অর্জন করেছে।'[৪৬] ছায়ানট প্রতিষ্ঠার ফলে দেশব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক আলোড়ন ও জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। দেশের প্রান্তিক থানা এবং জেলা পর্যায়ে সংস্কৃতি কর্মীগণ সাংস্কৃতিক কর্মীবিকাশের ক্ষেত্রে সংগঠন তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। তারা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সংস্কৃতিচর্চা এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে সাংগঠন তৈরিতে মনোযোগী হন। এক্ষেত্রে 'করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদ (১৯৬২)' 'ঐকতান (১৯৬৩)' 'সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় (১৯৬৩)' 'নজরুল একাডেমী (১৯৬৪) সংগঠনগুলো বাংলা ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ তথা শুদ্ধসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারই ধারাবাহিকতায় সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অফিসকর্মী, রাজনৈতিক কর্মীসহ দলমত নির্বিশেষে বাংলা ভাষা সহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত বিজয় সংস্কৃতি কর্মীদের হাত ধরে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে আলোকিত হয়ে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তর-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবা, কৃষাণ-কৃষাণীসহ সকলের মুখেই ভাষামুক্তি, দেশমুক্তির গান ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে নারীর সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় মেলে, 'করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদ (১৯৬২)',-এর চায়না মুখার্জী, বকুল, জলি, রঞ্জনা, হোসনে আরা প্রমুখ এবং 'ঐকতান (১৯৬৩)'-এর মাসুমা খাতুন, মালেকা আজিম খান, জাহানারা ইসলাম, নাসরিন চৌধুরী, লাইলী চৌধুরী, তাজিন চৌধুরী, আজিজা চৌধুরী তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বগুড়া, ঢাকার পাশাপাশি খুলনায় 'সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় (১৯৬৩)' তার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন–জাহানারা বেগম ছিলেন এই সংগঠনের কর্ণধার। আর 'নজরুল একাডেমী (১৯৬৪)'-এর অন্যতম নারী সদস্য মাফরুহা চৌধুরী ও ফেরদৌসী রহমান, লায়লা আর্জুমান্দ বানু তাদের কর্মস্পৃহা দিয়ে সাংগঠনিক যোগ্যতার প্রামাণ রেখেছেন। এছাড়াও 'ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৭)' 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৬৮),' নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় (১৯৬৮)'–তাদের সাংস্কৃতিক কর্ম ও সাংগঠনিক যোগ্যতার বলে গণ-মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রান্তিশিল্পীগোষ্ঠীর আবেদা বেগম, দুলু, মিনি জাহানারা, নিলুফার বেগম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, আনজুম, কুসুম, কল্যাণী ঘোষ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনিমা সিংহ, ফরিদা আক্তার, লীনা চক্রবর্তী, সেলিনা দেওয়ান, কামরুন্নাহার হেলেন, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, বেগম মুশতারী শফী, নীলিমা ইব্রাহিম, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, সুফিয়া কামাল, সন্‌জিদা খাতুন, ফিরোজা বেগম, জাহানারা ইমাম, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী প্রমুখ দেশবরেণ্য নারী-সংস্কৃতি কর্মীগণ তাদের ব্যক্তিগত ঔজ্জ্বল্য এবং সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিদর্শন স্থাপন করে সমগ্র জাতির বিবেকের কাছে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হতে পেরেছেন।[৪৭]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'বেগম ক্লাব'-এর নাম অগ্রগণ্য। বিশ শতকে নারীর কণ্ঠস্বর হিসেবে 'বেগম' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এরই ধারাবহিকতায় গড়ে ওঠে নারী জাগরণের অন্যতম সংগঠন 'বেগম ক্লাব'। 'বেগম'-এর সেবাব্রতকে আরো বিস্তৃত করার জন্যে এবং মহিলাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর শামসুন্নাহার মাহমুদকে প্রেসিডেন্ট এবং নূরজাহান বেগমকে সেক্রেটারি করে 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম ক্লাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নূরজাহান বেগম বলেন: *বেগম*-এর সেবাব্রতকে আরও সুদূর প্রসারী করার জন্যে, সাপ্তাহিক *বেগম*-এর লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য সাহিত্যিকের সমবায়ে একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। মহিলাদের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ চালানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।'[৪৮] বেগম ক্লাবে শুধু সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা নয়, নারীদের সমস্যা শ্রবণ ও মতামত প্রদান পূর্বক কার্যক্রম পরিচালিত হত। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য রাজিয়া বানু, আশালতা সেন, দৌলতুননেসা ও সর্বদলীয় নারীরা এখানে আসতেন এবং নিজেদের মতামত তুলে ধরতেন। সর্বোপরি, এই ক্লাব ছিল পূর্ব-বাংলার লেখিকা, রাজনীতিবিদ, সামাজকর্মী ও সংস্কৃতি কর্মীদের মিলনস্থল। ক্লাবের সদস্যদের সম্মিলিত হওয়ার সীমানা ছিল পুরান ঢাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শান্তিনগর, পুরানা পল্টন, অজিমপুর। নারীরা মুকুল সিনেমা হল, সদরঘাটের কাছাকাছি মহিলা পার্ক (করোনেশন পার্ক) ও বেগম ক্লাব এই তিন স্থানে সমবেত হতেন। বেগম ক্লাবে তারা পারস্পরিক মতবিনিময়, নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এছাড়াও আন্তার্জাতিক ভাবে খ্যাত বিশিষ্ট মহিলাদের, বিশিষ্ট নারী নেত্রীদের এবং লেখিকা, গায়িকা ও শিল্পীদের সংবর্ধনা দেয়া হত প্রতিষ্ঠান থেকে। আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্য দিয়ে বেগম ক্লাবের বেগম ক্লাবভিত্তিক দেয়াল ঘেরা মিলনায়তন, লাইব্রেরী ও মঞ্চ টিনের বেড়ানির্মিত ভবন রূপান্তরিত হয় সুবিস্তৃত ভবনে। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বেগম ক্লাবের অন্যতম কাজ ছিল পল্লী উন্নয়ন বিভাগ নামের উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণনারীদের শিক্ষিত করা এবং বিবাহ ও পারিবারিক আইন নিয়ে কাজ করা। শামসুন্নাহার মাহমুদ, নূরজাহান বেগমসহ বেগম ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা মিলে বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশকৃত প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৬৪ সালে সামসুন্নাহার মাহমুদের মৃত্যুর পর এই ক্লাবের সভাপতি হন বেগম সুফিয়া কামাল; তিনি বেগম ক্লাবের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। বেগম ক্লাব ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের বহু নারীকবি, সাহিত্যিক সামাজ সেবীকে গুণীজন সংবর্ধনা দিয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন সারা তৈফুর, বদরুন্নেসা আহমেদ, নূরুন্নেসা খাতুন, বিদ্যা বিনোদিনী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাসহ বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। পূর্ব-বাংলায় তৎকালীন নারী জাগরণ, শিক্ষা, সমাজসেবা ও নারী প্রগতির জন্য সচেতন নারীরা সম্মিলিত কর্মসূচি নিতে পেরেছিলেন– সেক্ষেত্রে বিশ শতকে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল এই বেগম ক্লাব।[৪৯] পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত বিচারে, নারীর সাংগঠনিক তৎপরতা

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুস্থ-সাংস্কৃতিক চর্চা আর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দক্ষতার মেলবন্ধনে সূচিত হয় নারীর অগ্রযাত্রা।

উপসংহার

নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারীপ্রগতি, নারীকল্যাণ—এক কথায় বলতে গেলে পূর্ব-বাংলায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৯২১-১৯৭০ সময়কালব্যাপি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে দিয়ে মহীয়সী কৃতবিদ্য নারীগণ তাঁদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শাসন-শোষণ-তোষণ ও ধর্ম-সম্পৃক্তির বিপরীতে এবং পুরুষশাসিত সমাজের বিপরীত স্রোতে সাঁতার কেটে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন মাটি—সেই মাটিতে বুনে দিয়েছিলেন প্রত্যাশা ও প্রতিষ্ঠার বীজ; যার ফসল আজ আমরা ভোগ করছি। অবিভক্ত ভারতীয় ভূ-ভাগে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' এবং 'বঙ্গবঙ্গ বিরোধী' আন্দোলনের প্রভাব সেই সময়ের নারীদের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতার বীজ বুনে দেয়। ফলে বাংলা বিশেষত, পূর্ব-বাংলা বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র রূপে পরিচিতি লাভ করে। বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে শাসকের চোখের অন্তরালে গড়ে ওঠে একাধিক 'গুপ্ত সমিতি' ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'দীপালী সংঘ'—এই সংঘের মর্মমূলে ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে সহজবোধ্য করার জন্য লীলা নাগ নারীশিক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজে বেঁচে থাকার জন্য, স্বনির্ভর জীবন-যাপনের জন্য, অর্থনৈতিক ভাবে স্ববলম্বী হবার ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে মনোযোগী হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC) ভোটাধিকার ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে কাজ করে। তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' পূর্ব বাংলার নারীদেরকে সমাজের কল্যালমূলক কর্ম ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে নারীর অধিকার আদায়ের প্রশ্নে কাজ করে যেতে থাকে। 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি'—যার সভানেত্রির দায়িত্ব পালন করেন সুফিয়া কামাল আর যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখেন যুঁইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগ। এই সমিতি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এছাড়াও 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'বেগম ক্লাব' নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিশীলিত চর্চার অবদানে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক কর্মের বিচারে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি', 'ছায়ানট'-এর অবদান অপরিসীম। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ছায়ানট' মননশীল ও সৃজনশীল তথা বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতিচর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রণকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময়ের প্রগতিশীল, স্বনামখ্যাত মুক্তবুদ্ধির মানুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি' এবং 'ছায়ানট' ধীরে ধীরে সংস্কৃতি-চেতনা ও দেশ-চেতনার পাদপীঠে পরিণত হয়। বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, নিবেদিতা নাগ, প্রমুখের বপিত সংস্কৃতির বীজ বৃক্ষসম একাধিক

সমিতি ও প্রতিষ্ঠান কালের বিবর্তনে বাঙালির ভাষামুক্তির, দেশমুক্তির আধারে পরিণত হয়–দেশব্যাপি মুক্ত চেতনায় উদ্ভাসিত নারীগণ শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়। উপরন্তু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দেশব্যাপী সাংগঠনিক আলোড়ন-বিলোড়নে পূর্ববঙ্গের নারীগণ কর্মমুখীন জীবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

'পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯২১-১৯৭০: নারীর সাংগঠনিক কর্মপ্রয়াস' বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে তাদের এই প্রতিষ্ঠা একদিনে কিংবা রাতারাতি আসেনি; বহুপথ মাড়িয়ে, নানা প্রতিকুলতা অতিক্রম করার ফল এই প্রতিষ্ঠান–জেল-ঝুলুম-নির্যাতন সহ্য করে আমাদের মহিয়সী নারীনেত্রী ও সংস্কৃতি কর্মীগণ পথ নির্মাণ করেছিলেন বলেই আমরা সেই পথেই হেঁটে চলছি। আমাদের আলোচ্য নারী নেতৃত্ব ও নারী সংগঠনসমূহের দেখানো পথই আলোর দিশারী।

তথ্যনির্দেশ

১. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ১৭
২. কমলা দাশগুপ্ত, ঊর্মিলা দেবী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৬৯
৩. সন্দীপ দাশ, স্বাধীনতার অগ্রযাত্রায় বিপ্লবী দেশনেত্রী, (অজয় রায় ও অন্যান্য সম্পাদিত), *লীলা নাগ: শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৫
৪. রংগলাল সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগ, *লীলা নাগ: শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, (অজয় রায় ও অন্যান্য সম্পাদিত), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২-২৩
৫. সুস্নাত দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রীসমাজ-একটি সামগ্রিক রূপরেখা*, (বরুণ দে সম্পাদিত), *মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র-সমাজ*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, টিচার্স কনসার্ন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭
৬. দীপংকর মোহান্ত, *লীলা নাগ*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১০. সুস্নাত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১১. দীপঙ্কর মোহান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮
১২. সুস্নাত দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১৩. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-১৯৯৩, পৃ. ২০
১৪. আরিফা সুলতানা, বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে নারী: ১৯০৫-১৯৪৭, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৮৮-১৯০
১৫. আরিফা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪
১৬. কমলা দাশগুপ্ত, আশালতা সেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ১০৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯
১৮. আনোয়ার হোসেন, অন্দরমহল থেকে রাজপথে: ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী: ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, পৃ. ১৯৬-১৯৭
১৯. সাপ্তাহিক আমোদ, কুমিল্লা অভয় আশ্রম, স্বনির্ভরতার প্রতিষ্ঠান এখন পরনির্ভরতায়, জুন ৩, ২০২১
২০. কমলা দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯২
২৪. কনক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
২৮. আনোয়ার হোসেন, *দেশভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১), স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী : ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, পৃ. ২১৮-২১৯
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
৩০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, বিভাগোত্তর কাল ও পাকিস্তানের নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১২১
৩১. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৩৩. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩১
৩৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৭
৩৫. আবুল ফজল, *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুক্তধারা, ১৯৭৪, পৃ. ৩২-৩৩
৩৬. মোতাহের চৌধুরী , *সংস্কৃতি কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১
৩৭. শান্তা পত্রনবীশ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১, এম.ফিল, অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০, পৃ. ১৬৫
৩৮. দৈনিক মিল্লাত, ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৪
৩৯. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, সওগাত প্রেস, ঢাকা, পৃ. ১৩২২-১৩২৩
৪০. রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা ১৯৫২, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১), পৃ. ১৯১
৪১. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, সওগাত প্রেস, ঢাকা, পৃ. ১৩৪৪
৪২. শান্তা পত্রনবীশ, বিশ শতকে বাংলার নারী জাগরণ: বেগম পত্রিকা ও বেগম ক্লাবের ভূমিকা, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা: ৩৯-৪০, ২০২১, পৃ. ৪৩৬-৪৩৮
৪৩. রেজোয়ান সিদ্দিকী, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১৯৫৫, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১), জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, পৃ. ১০২।
৪৪. শান্তা পত্রনবীশ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৭৮
৪৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৪৬. শান্তা পত্রনবীশ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাংগঠনিক বিকাশে নারী, এম.ফিল, থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০, পৃ. ১৭২-১৮৪
৪৭. শান্তা পত্রনবীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৪১
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৪১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩০/ডিসেম্বর ২০২৩

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প : আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনার রূপায়ণ

কামরুন নাহার*

সারসংক্ষেপ

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতায় সমকালীন অনেক লেখক থেকে স্বতন্ত্র। রচনাকৌশল ও গদ্যশৈলীর বিশেষত্বে তিনি বাংলা গল্পে বিস্তৃত পরিমণ্ডলে একটি ভিন্নমাত্রিক ধারার সংযোজন ঘটিয়েছেন। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগে উন্মূল মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ মনোজগৎ, শিকড় ছিঁড়ে চলে যাওয়ার হাহাকার এবং উৎসে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর বেশকিছু গল্পের ক্ষেত্রভূমি। পারিপার্শ্বিকতার কারণে চরিত্রগুলোর আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনাও তাঁর গল্পের অন্যতম প্রবণতা হিসেবে লক্ষ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণী আলোচনার মাধ্যমে তাঁর আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনামূলক পর্বের গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপণ করে, চরিত্রগুলোর উদ্বাস্তুচেতনা ও উদ্বাস্তুজীবনের কারণ চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা থাকবে। সেই সঙ্গে গল্পের পারিপার্শ্বিকতা কী করে চরিত্রগুলোর আত্ম-অনুসন্ধানে ও স্থানান্তরে উৎসাহী করে তোলে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এর ফলে তাদের কী পরিবর্তন ঘটে তা নিরীক্ষা করে বিশ্লেষণ করাও বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

চাবি শব্দ: অমিয়ভূষণ মজুমদার, ছোটগল্প, আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর, উদ্বাস্তুচেতনা।

১

অমিয়ভূষণ মজুমদার বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাঁর গল্পে উপজীব্য করার পাশাপাশি পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে উদ্ভূত দুই বাংলার বিপর্যস্ত জনজীবনের মর্মস্পর্শী বর্ণনাকে নান্দনিকভাবে রূপায়িত করেছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উদ্ভূত উন্মূল সমস্যা তাঁর গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উৎস থেকে উৎখাত হয়ে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা কিংবা পুনর্বাসিত হওয়ার পর পুনরায় উৎসে ফেরার হাহাকার তাঁর বেশকিছু গল্পে শিল্পিত রূপ পেয়েছে। একই কারণে তাদের মধ্যে আত্ম-অনুসন্ধান তথা শিকড়সন্ধান এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানান্তর ঘটার প্রবণতা লক্ষণীয় তাঁর উপর্যুক্ত পর্বের গল্পসমূহে। একই ঘরানার কিছু গল্পে এমন কিছু চরিত্রের দেখা মেলে যাদের স্থানান্তর ঘটে, বাস্তুভূমি থেকে উৎখাত কিংবা ভিন্ন কোনো কারণে নয়; এই চরিত্রগুলো গতানুগতিক জীবন যাপনে ক্লান্ত হয়ে কোনো এক পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করে। পূর্ণতার জন্য তাদের এই নিরন্তর সন্ধান ও যাত্রার অনুষঙ্গ অমিয়ভূষণের বেশ কয়েকটি গল্পে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'অ্যাভলনের সরাই', 'সাদা মাকড়সা', 'উরুণ্ডী', 'দুলারহিনদের উপকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলোতে যুদ্ধপরবর্তী বাস্তুচ্যুতির কারণে স্থানান্তর যেমন ঘটেছে, তেমনই স্বভাববৈরাগ্য কিংবা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

যাযাবরমনোবৃত্তির কারণে তাদের স্থানান্তর ঘটেছে। আবার কোনো-কোনো গল্পে দেখা যায়, চরিত্রের বহুগামিতার কারণে তাদের স্থানান্তর ঘটে। প্রতিকূল পরিবেশ ও জৈবিক প্রবণতার কারণে যে-স্থানান্তর ঘটে তা-ই গল্পের চরিত্রগুলোর পরিণতি নির্ধারণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে অমিয়ভূষণের গল্পের চরিত্রগুলোর এই স্থানান্তরের কারণ ও প্রবণতাগুলোই চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

২

নিজে উদ্বাস্তু না হলেও এই জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই এই জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ও শৈল্পিক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল অমিয়ভূষণের পক্ষে। বাস্তুহারা মানুষের যন্ত্রণা নিজের চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারই প্রথম লেখেননি। এই উপমহাদেশের অধিকাংশ লেখককেই যেহেতু রাজনৈতিক উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছে, তাই তাঁদের অনেকেই সমকালকে এড়িয়ে সাহিত্যসাধনা করেননি; উদাহরণ স্বরূপ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*, কমলকুমার মজুমদারের *তাহাদের কথা*, মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* উপন্যাস এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি', রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ', সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় কোনো-কোনো রচনায় উদ্বাস্তুচেতনা ও এই সমস্যার কারণে স্থানান্তর এসেছে, যেগুলোর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের *জলপাইহাটি*, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় *মানুষের ঘরবাড়ি*, নারায়ণ স্যান্যালের *বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অর্জুন*, মাহমুদুল হকের *কালোবরফ* উপন্যাস; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্থানে ও স্তানে', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী', দেবেশ রায়ের 'উদ্বাস্তু', সদত হোসেন মান্টোর 'শরিফানা' গল্প; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বাস্তু', জসীম উদ্‌দীনের 'বাস্তুত্যাগী', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী' কবিতা এবং বিমল করের *গোত্রান্তর*, সলিল সেনের *নতুন ইহুদী* ও ঋত্বিক ঘটকের *দলিল* নাটক উল্লেখযোগ্য। সঙ্গত কারণেই উদ্বাস্তু-সমস্যা ও অনিকেতবাসনা হয়ে উঠেছে সাহিত্যের অন্যতম সুর। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বরেন্দু মণ্ডল জানান:

> 'রিফিউজি স্টাডিজ' বা 'উদ্বাস্তু চর্চা' নিয়ে সম্প্রতি বিদ্যায়তনিক চিন্তা-চর্চার নতুন পরিসর নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য 'পার্টিশান সাহিত্য'-এর থেকে আমরা 'রিফিউজি স্টাডিজ'কে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে চাই। দেশভাগের বাস্তবতা, দেশভাগের রাজনীতি, দেশভাগের হিংসা, দেশভাগের ট্রমার সঙ্গে রিফিউজিদের ইতিহাস-বাস্তবতার যোগসূত্র থাকলেও তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ভিন্নতর। ...বিশ্বযুদ্ধ, নয়া-উপনিবেশবাদ, দেশভাগের সঙ্গে 'মাইগ্রেশন অফ পপুলেশনের' অতীত সূত্রগুলোর সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও—একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, জাতিদাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ ও পররাষ্ট্রনীতির ফলে উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল বা তাদের পুনর্বাসন নীতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে।[১]

২.১

এই বিষয়ে নিজস্ব পরিসর গড়ে তোলে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আলোচ্য গল্প। তাঁর উদ্বাস্তুচেতনামূলক পর্যায়ের কিছু-কিছু গল্পে স্থানান্তর শুধু টিকে থাকার তাগিদে আসেনি, গভীর জীবনবোধে আছন্ন হয়ে, কিংবা বৈচিত্র্যের সন্ধানে বর্তমান জীবন থেকে বিরতি নেয় তার কোনো-কোনো চরিত্র। 'সাদা মাকড়সা' এমন ধরনের গল্প। তবে স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে কেবল বেঁচে থাকার জন্য স্থানান্তরও তাঁর গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'অ্যাভলনের সরাই' (২০১০) এমনই এক গল্প। গল্পটি যুদ্ধে বাস্তুহারা মানুষের নিরালম্বন ও অসহায়ত্বের বিশেষ রূপকল্প। যুদ্ধশিবির থেকে বেঁচে-ফেরা একদল মানুষের বর্তমান উদ্বাস্তুজীবন ও সেই জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পথ-চলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধপরবর্তী ক্রমধাবমানতার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে গল্পটিতে। পাশাপাশি উদ্বাস্তু জীবনের নঞর্থক পরিণতির ইঙ্গিতও সূক্ষ্ম কিন্তু নান্দনিক উপায়ে নির্ণিত হয়েছে এই গল্পে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, যুদ্ধাহত শরণার্থী দল পুনর্গঠিত ইউরোপে পুনর্বাসিত হচ্ছে। আপাতত তাদের লক্ষ্য 'অ্যাভলন' নামক স্থানের কোনো এক সরাইখানা। সেন্ট সাইমন, দেহপশারিণী নিনা, সন্তান হারানো অধ্যাপক দম্পতি, বৃদ্ধ আইজ্যাক, কাস্টমসের কেরানি ফেরেন্স প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে বিগত দিনের দুঃসহ স্মৃতি, বর্তমানের দুর্বহ জীবন, ভবিষ্যতের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ও উদ্বাস্তু জীবনের অনিয়শ্চয়তাকেই গল্পে শিল্পিত করেছেন লেখক।

'অ্যাভলনের সরাই' গল্পের সেন্ট সাইমন এই দলের একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। পাদরিদের মতো পোশাক, পরিশীলিত আচরণ ও পরোপকারী মনোভাবের কারণে তাকেই দলনেতা মনে হয়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্নিবেশিত হওয়া এই দলটির পূর্বস্মৃতিতে জানা যায়, সেন্ট সাইমনের আগে, অ্যাভলনের পথের আগেও তারা আশাজাগরুক কিছু মানুষ ও পথের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেওয়া বোশাম্প নামক নেতার ভুল এবং স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের মারপ্যাঁচে নিকোলা নাম্নী নেতার গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে তারা তাদেরকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। অন্যসব সম্ভাবনার আলো তিরোহিত হলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাদের শেষ আশা অ্যাভলনের পথ, আর সেই সংকটাপন্ন পথে এবারে তাদের সারথি সেন্ট সাইমন। যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু পরিচয়ে চিহ্নিত পরস্পর অপরিচিত এই দল কেবল সময়ের তাগিদে, নিজেদের প্রয়োজন ও লক্ষ্যের অভিন্নতার কারণে একসঙ্গে পথ চলে। তাদের মানবিকতাবোধ যুদ্ধে বিধ্বস্ত,চেতনাও বিনষ্ট, তাই সেন্ট ব্যতীত সকলেই আত্মপর। এদের মধ্যে যারা দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন, তারা বর্তমানের যে-কোনো ভয়াবহতায় ফিরে যায় অতীতের দুঃসহ স্মৃতিতে। প্রবল মানসিক বিপর্যয়ের ফলে তাদের কেউ-কেউ (ভ্যান ব্রন) বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। আবার কেউ (বৃদ্ধ আইজ্যাক) বয়সের ভারেই চলার পথে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। পুরোনো মানুষ হারিয়ে ও নতুন মানুষ যুক্ত হয়ে দলটি ক্রমে নবরূপ ধারণ করে। নেতৃত্ব নিয়ে ভরসার অভাব ও দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সেন্ট সাইমনের উপরই নির্ভর করে, যদিও বিগত দিনের প্রতারণার কথা

তাদের কারও-কারও (ফেরেন্স) মনে পড়ে যায়, 'আবার কেউ তাদের প্রবঞ্চনা করেছে, যে হয়তো বোশাম্পের মতো রাজনীতির চোরাগলিতে পথ চেনে না।'[২]

শেষ পর্যন্ত অ্যাভলনের পথে তাদের পথপ্রদর্শক সেন্ট সাইমন ঠিক যোগ্য নেতার মতোই মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে গভীর ক্যানিয়ন পাড়ি দিতে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো জীর্ণ দড়িকে সেতু হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। দলটির কাছে উদ্বাস্তু জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণার একমাত্র উপশম অ্যাভলনের সরাই, যার পথদ্রষ্টা হিসেবে তারা নির্ভর করেছে সেন্ট সাইমনের ওপর। কিন্তু কোমরে লুকানো পুরোনো পিস্তল ও নিনার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন ইত্যাকার বিষয়গুলো দিয়ে লেখক ইতঃপূর্বে ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন যে, মুখোশ ও পোশাকের মাধ্যমে সেন্ট যতই রহস্যময় কিংবা ঐশ্বরিকভাবে নিজেকে উপস্থাপন করুক না কেন, সে নিজেও এক সাধারণ উদ্বাস্তু এবং অন্য সবার মতো সামনের পথ সম্পর্কে অজ্ঞাত। আর তাই দড়ি ছিঁড়ে সেন্টেরমৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এটাই উপলব্ধ হয় যে সেন্ট বাকি সবার মতোই সাধারণ।

পুরো গল্পটিতে উহ্য থাকে অ্যাভলনের সরাইয়ের কথা তাদের কে বলেছে, পথের দিশা কে দেখিয়ে দিচ্ছে। দিকনির্দেশিকার প্রসঙ্গে প্রতিবারই, 'শোনা গেল', 'গুজব', 'খবর এল' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়, কিন্তু শব্দগুলো কারা বয়ে আনে সেটি প্রকাশিত নয়। আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য সবুজ অধিত্যাকার আভাস পেয়েই অ্যাভলনের সরাইয়ের যে-চিত্র যাত্রীদলের মানসচক্ষে দেখা দেয় তা '...সবুজ অধিত্যাকায় আইভির লতা সমেত। আইভি ছাড়া আর কি? যদি তা আঙুরের না হয়। বাড়ি ঘর, হলুদ দেয়াল, লাল ছাদ, তার একপাশে সাদা গম্বুজের চার্চ।'[৩] এসব রূপকল্প অর্থাৎ 'আঙুর', 'চার্চ' এবং পূর্বব্যবহৃত 'আভে মারিয়া' (যা যাত্রীরা শুনতে পায়), পথপ্রদর্শকরূপে পাদরিসদৃশ সেন্ট সাইমন প্রভৃতি বিষয়গুলো যাত্রীদলের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ঐশ্বরিক সমর্পণের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। যদিও লেখক আইজ্যাকের মাধ্যমে জানিয়ে যান যে, ''ক্রাইসিসের সময় ধর্মে সমর্পিত হওয়া মানুষের সাধারণ ধর্ম হলেও, 'ধর্ম বিষয়টাই যৌবনের পক্ষে আকর্ষণীয় নয়, সভ্য সমাজের যুবকদের চার্চে যাওয়ার রীতি থাকলেও।''[৪]

অমিয়ভূষণের গল্পের আঙ্গিক ও ভাবকে জিওফ্রে চসার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার সঙ্গে তুলনা করে সমালোচক তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়বলেন, 'অমিয়ভূষণের ছোটগল্পকে কখনও চসার ধর্মীয় ভাবা যায়। অন্তত অ্যাভলনের সরাইয়ের মধ্যে ক্যান্টারবেরি টেলসের যাত্রী সমূহের রূপকথার ভঙ্গিটি বোধ হয়, ধরাই যায়। আর মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের তীর্থযাত্রীর কথা।'[৫]

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' (১৯৩০) কবিতায় ভিন্ন-ভিন্ন স্বভাবের একদল যাত্রীকে দেখা যায়, যারা পতনোন্মুখ বর্তমান জীবন থেকে মুক্তি পেতে পথে নেমেছে কোনো এক অধিনায়কের নেতৃত্বে অ্যাভলনের সরাইয়ের মতোই কোনো এক রাজার দুর্গের উদ্দেশ্যে। পথের ক্লান্তি, পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় কারণে নির্ঘুম রজনি, বিশ্রামের অভাব ইত্যাদি নানান উত্থানপতন শেষে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে কথিত রাজার দুর্গতাদের আরাধ্যভূমি নয়; নতুন দিনের

সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে কবিতাটিতে পর্ণকুটিরের আবির্ভাব ঘটে। তাদের তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হয় কুটিরের মধ্যকার মায়ের কোলে থাকা শিশুটিকে দর্শন করে। কোনো পরাক্রমশালী শক্তি নয়, রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থে' মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন, নবজাতকের রূপকে জীবনবাদ, প্রাণচাঞ্চল্য ও জীবনের চলিষ্ণুতাকে পরিগ্রহ করেছেন তিনি। আবার জিওফ্রে চসারের *ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্* (১৪৭৮)-এর থমাস বেকেটের সমাধিস্থলের উদ্দেশে গমনরত তীর্থযাত্রীদের গল্প বলার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে উচ্চ থেকে নিম্ন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনোভঙ্গি প্রকাশিত। জগতের আনন্দ-বেদনা, সুখ-অসুখ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি পার্থিব লৌকিক বিষয়ের সঙ্গে পারলৌকিক প্রত্যাশার মিলন ঘটাতে গিয়ে প্রতিযোগীদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তীর্থযাত্রার ভঙ্গিটি ছাড়া 'শিশুতীর্থ' কিংবা *ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্*-এর ইতিবাচকতা থেকে বহুদূরে অবস্থান 'অ্যাভলনের সরাই'-এর। 'শিশুতীর্থ' কিংবা *ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্*-এর যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু অ্যাভলনের যাত্রীদের যাত্রা অনিঃশেষ।

উদ্বাস্তুদলের স্মৃতিরোমন্থনের মাধ্যমে লেখক খুব ধীরে-ধীরে যুদ্ধের ভয়াবহতা উন্মোচন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত মন নিয়ে তারা এখনো বেঁচে আছে অ্যাভলনের পথের ভরসায়। অ্যাভলনের সেই পথের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হলেও হয়তো তারা বেঁচে থাকবে, ক্ষুদ্র কোনো ইঙ্গিত থেকে নতুন আশায় বুক বেঁধে পুনরায় একই পথের সন্ধান করবে। 'অমিয়ভূষণ পথের ডাক শুনেছেন, কিন্তু পথের শেষ কোথায় তা জানার জন্য ব্যাগ্র হননি'।[৬] আর তাই এই গল্পের চরিত্ররাও পথের শেষ সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকেও পথ চলে। কোথাও না কোথাও এর শেষ আছে এই প্রত্যাশায় বারবার হতাশ হয়েও পথের গোলকধাঁধায় আটকে যাবে তারা। যদিও অ্যাভলনের সরাইয়ের হাতছানিকে কখনো কখনো 'অর্বাচীন কোনো রাজনৈতিক স্বপ্নদ্রষ্টার ছড়ানো'[৭] গুজব বলেও মনে করে তারা। তারপরও এই গুজবে কান দেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

গল্পের ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণের করণকৌশলের বিশেষত্ব হলো বিষয়বস্তু, অন্তর্নিহিত সত্য কিংবা পরিণতির ক্ষেত্রে তিনি ধীর-উন্মোচনের পক্ষপাতী; নানা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে গল্পের লক্ষ্যে পৌঁছেন তিনি। বর্তমান গল্পেও তাঁর এই কৌশল অক্ষুণ্ন রেখে খুব সন্তর্পণে সত্য-উন্মোচনের পথে পরিক্রমা করান পাঠককে। অ্যাভলনের পথের প্রবঞ্চনার কথা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে প্রস্তুত রাখতে রাখতে তাদের এগিয়ে নিয়ে যান চূড়ান্ত প্রবঞ্চনার দিকে। ক্যানিয়ন পাড়ি দেওয়ার আগে প্রস্তুতি হিসেবে সেন্ট নিজের মুখোশ উন্মোচন করে নিলে, নিনা দেখে 'সেন্ট সাইমনের মুখে নাকের বদলে শুধু দুইটা গর্ত ছিল।'[৮] মহাবিপর্যয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় খোঁজে। 'অ্যাভলনের সরাই' সেই ঐশ্বরিক আশ্রয়। 'শিশুতীর্থ'র ঐশ্বরিক আশ্রয়ের থেকে প্রধান হয়ে ওঠে নতুন দিনের শিশুর আগমন, জীবনবাদ। *ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্*-এ দেখা যায় ধর্মীয় বোধের মাঝেই সুপ্ত থাকে জীবনের প্রতি মমতা। কিন্তু 'অ্যাভলনের সরাই'-এর যাত্রীদের সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরে সমর্পিত করেও লেখক নিহিলিজমের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। গল্পে ঐশ্বরিক আশ্রয়ের যোগসূত্র হিসেবে সেন্টকে কল্পনা

করা হলেও সেই আশ্রয়ের অলীকতা ও উদ্বাস্তুজীবনের অনিশ্চিয়তার প্রতীক হয়ে ওঠে সেন্টের নাকের জায়গায় বিশাল গর্তদুটি। 'মূলহীন নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়তৃষ্ণার পরিণতি হয়তো-বা মৃত্যু কিংবা জীবনের সারাংশের বদলে নিরস একটা কাঠামো মাত্র।'[৯]

গল্পটিতে উদ্বাস্তু জীবনের নানান সত্যভাষের পাশাপাশি তাদের লক্ষ্যের শূন্যতারই নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে যা অমিয়ভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর অন্যতম অনুষঙ্গ। মার্সেল প্রুস্তের বরাত দিয়ে লেখা গ্যাব্রিয়েল জেসিপোভিসির মন্তব্য সত্য হতে দেখি অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রেও:

> Perhaps every significant artist has only one theme, on which he performs endless variations. All Dostoevsky's novels, Proust said, could be called crime and punishment, all Flaubert's L'Éducation sentimentale, all Kundera's novels could be called life is elsewhere.[১০]

দস্তয়েইফ্স্কি, ফ্লুবার্ট ও কুন্দেরা যেমন মানবসত্তার উন্মীলিত চেতনার অনুবর্তন ঘটান, তেমনই অমিয়ভূষণ মজুমদারও তাঁর বেশ কিছু রচনায় আধুনিক মানুষের এই উদ্বাস্তুচেতনার পুনরাবৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

২.২

ক্রমস্থানান্তরিত জীবনের আরেক শিল্পসফল প্রকাশ 'উরুণ্ডী' (২০১৬)। এই গল্পে 'অ্যাভলনের সরাই'-এর মতোই একদল বাস্তুহারা মানুষ আবাসন অন্বেষণের লক্ষ্যে পথে নামতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই দল যুদ্ধ কিংবা দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু নয়, তাদের পূর্ব ভূমি অর্থাৎ মিরানি গ্রামের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের এই পথ-চলা বা 'এক্সোডাস'। 'পুলিন বলল— ফারাও ছিল মিশরের রাজা। তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এক দল লোক বেড়িয়ে পড়েছিল পিতৃভূমির খোঁজে। তাকে এক্সোডাস্ বলা হয়ে থাকে।'[১১]

বহুদিন ধরে ক্রমাগত পথ চলে দলটি আপাত-থিতু হয়েছে উরুণ্ডী নামক মফস্বলে, যদিও বায়ান্নজনের দলটিতে বর্তমানে বাইশজন টিকে আছে। বাকিদের কেউ অ্যাভলনের যাত্রীদের মতোই চলার পথে মৃত্যু বরণ করেছে, কেউ ফিরে গেছে। আবার কেউ মতপার্থক্যের কারণে দল ছেড়ে নতুন পথের সন্ধান করেছে। স্বৈরতন্ত্র, রাজনীতির কূটচাল, পুঁজিবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া, সমঝোতাবিরোধী, নতুন পথের সন্ধানী সেই ব্যক্তি পুলিন। শোভাসহ বাকি যারা এখনো দলে টিকে আছে তাদের অনেকেই প্রয়োজনের তাগিদে আপোস করতে বাধ্য হলেও, সম্ভাবনা আছে যে শোভার মতো দলের কেউ-কেউ পুলিনের অনুগামী হবে। শোভার চোখে দেখা 'অন্ধকারের নীল পাহাড়' আর মাধবের 'আহো' ডাক পুলিনের মতোই পুনরায় বেড়িয়ে পড়ার আহ্বান। যদিও ছ-মাসের উরুণ্ডীবাস তাদেরকে আগেকার উদ্বাস্তুদশা থেকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, কিন্তু তা সাময়িক স্থিতিশীলতামাত্র। শোভা এখনো একবেলা খাবার খায়, দু'বেলা খাবারগ্রহণ তার জন্য বিলাসিতা। তিনটি তাঁত, একটি সেলাই কল এবং ধানকলের একটি চাকরির জন্য তাদের ভোট-বিনিময়ের কথা ভাবতে হয়। একটি টিউবওয়েলের জন্য তাদের ধর্না দিতে হয় দিনের পর দিন। মাত্র এক কাপ চা-ও তাদের কাছে জীবনবাদের প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। লেখক অতি

সূক্ষ্মভাবে অকালবিধবা শোভার সঙ্গেপুলিনের সম্পর্কটিকে গল্পে নিরূপণ করেছেন, এবং এর নেপথ্যেও ক্রিয়াশীল রেখেছেন শোভা কর্তৃক পুলিনকে দলে ধরে রাখার প্রচেষ্টাকে, যদিও সেটি ব্যর্থ হয়।

যে-উরুণ্ডীতে নিজেরা থিতু হতে পারবে ভেবে একরাতে দেখা করতে আসা পুলিনকেও শোভা কোথাও না কোথাও স্থির হওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়, সেই শোভাই শেষ পর্যন্ত পুলিনকে নিয়ে ব্রজ চক্রবর্তীর অপপ্রচারের কারণে ইলেকশনের ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং উরুণ্ডীর মায়াজাল ছিন্ন করতে পারে। গল্পকার এখানেও এক প্যারাডক্স রেখে যান: আগে যে-ব্রজ চক্রবর্তী শোষিতের একজন হয়ে সরকারদলীয়কে হত্যা করে ফেরার হয়েছিল, যে ছিল একসময় এই দলের প্রধান, দশ বছরের ব্যবধানে সেই ব্রজ চক্রবর্তীই হয়ে ওঠে উরুণ্ডীর বড় ব্যবসায়ী। বর্তমানে করাতকল ও ধানকলের মালিক ব্রজ চক্রবর্তী উরুণ্ডীর প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইলেকশন করতে প্রস্তুত। গল্পটিতে লেখক মানুষের গোত্রান্তরের বিষয়টিও সূক্ষ্মভাবে জানিয়ে দেন, 'অনেক অনেক লোকের মধ্যে একজন কবি হয়, একজন দার্শনিক হয়, তেমনি আর একজন বেড়াজাল কেটে বেড়িয়ে পড়ে।'[১২] বেড়াজাল কেটে বেড়িয়ে পড়া সেই মানুষটিকে প্রথমে পুলিন ভাবা হলেও, গল্পপাঠে উপলব্ধি হয়, পুলিন দলের দিক-নির্দেশক হাঁস— দলে না থাকলেও সে এখনো দলনেতা। সে জানে দলের কেউ-কেউ তার সমর্থক হবে, তাদের এই বহির্গমন ক্রম প্রবহমাণ থাকবে। লেখকের ভাষায়, 'হাঁস ওড়া দেখেছো?... প্রথমে একটা ওড়ে, তারপর আর একটা, তারপর দেখাদেখি আর সবগুলো ঝাঁক বেঁধে ওঠে পড়ে।'[১৩] অন্যদিকে বেড়াজাল কেটে যাওয়া মানুষটি শর্ষের ভূতরূপী ব্রজ চক্রবর্তী। শ্রেণিশোষণের শিকার এখন নিজেই শোষক, ভোটের জন্য এই স্থানান্তরিত মানুষদের ক্রয় করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সমস্ত প্রাপ্তির দোরগোড়ায় এসে শেষ পর্যন্ত শোভা উপলব্ধি করতে পারে যে, উরুণ্ডীও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানেও মিরানি গাঁয়ের অন্ধত্ব তাদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। তাই পুনরায় প্রতারিত হওয়ার বদলে উড়াল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে। নতুন পথের দিশায় রোমাঞ্চিত শোভা টের পায় অন্ধকার সড়কের উত্তর মাথার নীল পাহাড়ের ইশারা। স্বপ্ন এখনো আছে,আর সেজন্যই হয়তো অন্ধকারেই শোভা সারা গায়ে খুশির দোলানি দিয়ে মাধবের 'আহো' ডাক কল্পনা করে। তার রক্তে জেগে ওঠে 'সেই অনুভব, সেই বোধ যা আমাদের সচল করে তোলে দূষিত আশ্রয় ছেড়ে নতুন আকাশের নীচে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য।'[১৪]

বাইবেল-এ বর্ণিত এক্সোডাসের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তার যোগসূত্র স্থাপন করে বর্তমান দলের অবস্থাকে আরও অনির্দিষ্ট করে তোলার পারদর্শিতায় গল্পটিতে ভিন্ন দ্যোতনার সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টপূর্ব তেরোশো শতকের ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে মোজেস ও তাঁর দল এক্সোডাস করেন। অনুসারীদের নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় উরুণ্ডীর দলটির মতোই অনেকে দলছাড়া হয়ে যায়। খাদ্যাভাব ও উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে তাদের কেউ-কেউ মোজেসের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মোজেসের ভাই অ্যারনসহ অনেকেই এই

অনিশ্চিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেও দলটি এসব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত মোয়াবে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য সম্পন্ন করে (*ওল্ড টেস্টামেন্ট*)। মোয়াব তাদের কাছে স্বাধীনতার পরিচয়বাহী আরাধ্যভূমিরূপে আবির্ভূত হয়। তাদের এক্সোডাস সম্পন্ন হয়। কিন্তু পুলিনদের দলের অনিশ্চয়তা আরও সুদূরে প্রোথিত। *বাইবেল*-এ মিশর-ত্যাগকারী দল মোয়াবে স্বস্তির সন্ধান পেলেও পুলিনের দলের ক্রমাগত স্থানান্তর হবে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কেন না নীল পাহাড়ের আভাস কেবল অন্ধকারেই দেখা যায়। সারা পৃথিবী ভরে দুর্নীতির দৌরাত্ম্য। এর সঙ্গে আপোসহীন থাকতে চাইলে ক্রমাগত এই এক্সোডাসের পথই বেছে নিতে হবে। গবেষক মৃদুল দত্তের মতে, 'বস্তুত অমিয়ভূষণের শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বিষয় যেন এই নিরন্তর সন্ধান ও যাত্রা। উদ্বাস্তুপুলিনরা হাঁস হয়ে উড়ে এসেছিল ওপাড়ের পৃথিবী থেকে।'[১৫]

অতীত-বর্তমান পরিভ্রমণের মাধ্যম 'উরুণ্ডী' গল্পের স্থানান্তর রহস্য ক্রমশ উন্মোচিত হয়। শোভার মাধ্যমে তাদের স্থানান্তরিত হওয়ার ইতিহাস বেশ খানিকটা উন্মোচিত হলেও এই গল্পে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সম্মিলিত প্রয়োজনই তাদের ক্রম-স্থানান্তরের কারণ উদঘাটন করে। গল্পটির বিষয়বস্তু অমিয়ভূষণের 'অ্যাভলনের সরাই'-এর মতো হলেও 'অ্যাভলনের সরাই'-এর মতো চরিত্রের মনস্তত্ত্বে গভীরে আলোকসম্পাত আলোচ্য গল্পে অনুপস্থিত। কিন্তু তা-ই বলে 'উরুণ্ডী' রসবিচারে নিম্নগামী, তা বলা যাবে না। দু-একটি রেখার মাধ্যমে চরিত্রকে স্পষ্ট করেও যে মূল সমস্যায় অভিনিবেশ ঘটানো যায়, তার অনন্য উদাহরণ 'উরুণ্ডী'। নিজের রচনায় উদ্বাস্তুজীনের প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেছেন:

> মানুষ মনের দিক দিয়ে উদ্বাস্তু হতে পারে। আর বাঙালির উদ্বাস্তু হওয়া নতুন কিছু নয়।... আমরা কালচার উদ্বাস্তু। পৃথিবীকে দেখে দেখেই তো উপন্যাস রচনা করা হয়।... 'কিং ডিফেন্ডার অফ ফেইথ'-এর উপর বিশ্বাস করে ইংল্যান্ডের লোকেরা এককালে যুদ্ধ ইত্যাদি সবকিছু করেছে। সেই বিশ্বাসের ভূমি, কালচারের ভূমি চলে গেছে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে আরেকটা মিথ পাব কি না সে দূরের কথা। যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ সবাই উদ্বাস্তু। প্রত্যেকটা লোক উদ্বাস্তু। ভেবে দেখো, কালচার খুঁজে পাচ্ছ না, তুমি একটা জায়গায় পৌঁছে দেখছ... আমার কিছু নেই, সেখানে তুমি উদ্বাস্তু।[১৬]

২.৩

'সাদা মাকড়সা' (২০০৫) গল্পের স্থানান্তর দ্বিমুখী। আত্ম-অনুসন্ধান ও উদ্বাস্তু জীবনের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটেছে এই গল্পে। গল্পটিতে একদল উদ্বাস্তুর দেখা মেলে,অন্ন আর আশ্রয়ের খোঁজে গ্রামছাড়া হয়ে যাদের যেতে হয়েছে চা-বাগানের সুদূর পরবাসে। সামান্য উন্নতির প্রত্যাশায় তাদের নারীদের উপগত হতে হয় মালিকপক্ষের সঙ্গে। বর্তমান জীবনের যেকোনো অপমানে তারা আশা পোষণ করে স্বর্গসদৃশ স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার। আরেক দল তাদের অর্থ ও সম্মানের জীবন ছেড়ে সহজ-সরল এই উদ্বাস্তু জীবনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। অথচ আরাধ্য জীবনের খোঁজ পেলে সেই জীবনে উভয়েই হাঁপিয়ে ওঠে। প্রথম দলের অর্থাৎ যাদের ভাগ্যের অন্বেষণে স্থানান্তর ঘটেছিল, তারাও যখন তাদের কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় ফিরে যায় সেখানে তারা আর স্থির হতে পারে না। দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ যারা সম্মানজনক পেশা ছেড়ে সহজ-সরল গ্রাম্যজীবনে

আত্মগোপন করেছিল, তারাও সেই সরলতার একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। দুই দলই যে-স্থানকে তাদের পূণ্যভূমি ভেবেছিল, সেই স্থান ছেড়ে তারা অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে, 'এমন না হলে জীবনকে কেউ কেউ ট্র্যাজেডি বলছে কেন? পৃথিবী থেকে স্বর্গ, স্বর্গে পৌঁছেই পৃথিবীর জন্য হাহাকার।'[১৭] এই গল্পে কাজের খোঁজ কিংবা উন্নত জীবনাকাঙ্ক্ষা স্থানান্তরের মূল কারণ হলেও ব্যালেন্টাইন ও ম্যাগী কিংবা টেম্মা কিংবা ম্যাগদালেন কিংবা ডোরোথি কুঙ্গার পাঠককে জানিয়ে দেয় এই দুই পক্ষ মূলত চেতনায়উদ্বাস্তু। প্রণয় নয়, এদের এক করেছে তাদের সম-আগ্রহ। উভয়েই কোনো এক সুদূরের প্রতি তৃষ্ণার্ত বলে এরা একে অন্যের সহযোগী হয়েছে; এখানে ভালোবাসা গৌণ বিষয়। এই আগ্রহের কারণেই সামাজিক স্তরবিভাজন, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতিকে বেপরোয়াভাবে উপেক্ষা করার সাহস পেয়েছে তারা। উল্লেখ্য, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যালেন্টাইন একক ব্যক্তি হলেও ম্যাগী কিংবা টেম্মা কিংবা ম্যাগদালেন কিংবা ডোরোথিকে লেখক একাকার করে দেন—এরা প্রত্যেকেই উদ্বাস্তু, বহু পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত, অর্থাভাব তাদের নিত্যসঙ্গী এবং সেই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় যারা অভিজাত ও সুদর্শন; সর্বোপরি তাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে সূদূর মগ্ন কোনো সত্তা। তারা কেবল বাস্তুভূমি থেকে উৎখাত হয়নি, তারা স্বভাব-উদ্বাস্তুও বটে। গল্পে তাই দেখা যায়,কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ফিরে গিয়েও তারা স্থির হতে পারে না, কাতর হয়ে পড়ে ফেলে আসা স্থানের জন্য।

গল্পে এই নারী চরিত্রগুলোকে বহু পুরুষ দ্বারা নিষ্পেষিত হতে দেখা যায়। অবস্থা বিবেচনায় সেই নিষ্পেষণকেই তারা স্বাভাবিক জেনেছে। এই ধারাবাহিকতায় গল্পের শুরুর দিকে পাওয়া যায় জেনকে, সদিয়ার কাছের কোনো এক জায়গা থেকে কাজের খোঁজে যার আগমন ঘটে ভারতের ম্যাগদালেন নামক চা-বাগানে। বংশপরম্পরায় জেনদের চা-বাগান-মালিকপক্ষের উপপত্নী হতে দেখা যায়। গোকূল, প্রথম জন, দ্বিতীয় জন, হ্যারল্ড, ক্যাপ্টেন ব্যালেন্টাইন, জেন, ঠাকুরা সিম্বা, মেজর, ম্যাগদালেন, ম্যাগী, টেম্মা, ডোরোথি প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে গল্পটি একটি সূত্রে গ্রথিত হলেও পাঠের ধারাবাহিকতায় অনুভূত হয় মালিকপক্ষের আত্মীয় রুকরিফেরত ইঞ্জিনিয়ার ব্যালেন্টাইন ও ম্যাগদালেন, ম্যাগী, টেম্মা ও ডোরোথিই এই গল্পের প্রেক্ষণবিন্দু। কথক বোনার্জিসহ বাকি চরিত্রগুলো কেবল এই চরিত্রগুলোকে উন্মোচন করার নিয়ামক। যদিও প্রথম জন, দ্বিতীয় জন ও হ্যারল্ডকেও কম গুরুত্ব দেননিলেখক, কিন্তু এই চরিত্রগুলোকে তিনি বিকশিত করেছেন ব্যালেন্টাইন ও চার নারীর বহুমাত্রিকতাকে উন্মুক্ত করবেন বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে ঝগড়া করে কথক বোনার্জি ওরফে ব্যানার্জি চা-বাগানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। পুরো গল্পের বয়ানও সম্পন্ন হয়েছে এই যুদ্ধক্যাম্প থেকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ কিছু চিঠির মাধ্যমে, যা ভারতবর্ষে অবস্থিত ম্যাগদালেন নামক চা-বাগানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। চিঠির অতীতচারণার মাধ্যমেই জানা যায় গল্পের ভরকেন্দ্র ম্যাগদালেনের কথা, যার নাম রাখা হয়েছিল চা-বাগানটির নামে। বাস্তুভূমি থেকে উৎখাত হওয়া জেন দম্পতির দারিদ্র্যের স্মারক ম্যাগদালেন। ভাগ্যের অন্বেষণে চা-বাগানে

ম্যাগদালেনের মা জেনের আগমন ঘটলে মালিকপক্ষকে তুষ্ট করার পরিণামে জন্ম হয়েছিল ম্যাগদালেনের। প্রথম জন-এর ঔরসজাত হওয়ার কারণে হয়তো ম্যাগদালেন চা-বাগানের অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে রূপে-গুণে স্বতন্ত্র ছিল, যদিও এই স্বাতন্ত্র্য তাকে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। প্রতিটি অপমানই ম্যাগদালেনকে বাস্তুভিটায় সপরিবারে প্রত্যাবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলত:

> জেন বলেছে তারা আর এই চা বাগানে থাকবে না, দেশে চলে যাবে। কোথায় তাদের দেশ?... 'তিন রাজার তিন নিশান পোঁতা আছে'। সেই নিশানকে পেছনে রেখে দাঁড়ালে ডুবন্ত সূর্যের আলোয় সেই দেশের প্রথম পাহারাদার জঙ্গল চোখে পড়ে।
> ... সেই পাহাড় বেয়ে উঠলে যে দেশ সেই দেশ জেনদের।[১৮]

দেশে ফিরে যাওয়ার এই স্বপ্ন জেন ও ম্যাগদালেনের মতো উদ্বাস্তু মানবেরা চা-বাগানের এই অপমানের জীবনে বাঁচিয়ে রাখে। অথচ সেই দেশ ফিরে পাওয়া গেলে তারা সেখানে স্থায়ী হতে পারে না। এদেরই আরেক সত্তা টেম্মা ওরফে ডরোথির মুখ দিয়ে লেখক বলিয়ে নেন, 'আমরা চিরদিনই এদেশে থাকতে পারব না। যুদ্ধের পরে যদি এদিকে কখনো তুমি আসো, নাম্‌চা বাজারে আমাদের খোঁজ করো— ডোরোথি কুঙ্গার খোঁজ করো তাহলেই হবে।... এই জীবন আমাদের স্যুট করছে না।'[১৯]

এই ডরোথিই মেজর-কথিত টেম্মা, কথকের ভাষায় চুলের রং আর সাজপোশাকের পার্থক্য ছাড়া ম্যাগদালেনের চেহারার সঙ্গে যার হুবহু মিল আছে। মেজরের বয়ান অনুযায়ী টেম্মার মতো অনেকেই যুদ্ধের বাজারে প্রাণভয়ে কিংবা পেটের দায়ে শরীরকে পুঁজি করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য লেখক টুয়িস্টও রেখে যান গল্পে, 'চিত্রাঙ্গদাও তো এদিকেরই মেয়ে।... ম্যাগদালেনের মা জেনেরও স্বামী ছিল। সাধারণ পুরুষে তার মন ওঠে না। তার বিশিষ্ট কল্পনার সেই অর্জুনকে সে খুঁজছে।'[২০] এই বক্তব্যে স্থানান্তরিত হওয়া মানুষের হৃদয়বেদনার ঊর্ধ্বে নারীর আত্ম-অনুসন্ধানের এক অনির্বচনীয় দিকের আভাস পাওয়া যায়, যেখানে নারী যোগ্যতমের শয্যাসঙ্গী হয় স্বেচ্ছায়। আর তাই জেন তার অলস, মদ্যপ ও হিংস্র স্বামীর বিপরীতে শিক্ষিত, রুচিশীল ও বিত্তবান প্রথম জন-এর আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেনি। তেমনই জীবনধারণের অন্য কোনো পেশা গ্রহণ না কওে টেম্মারও যুদ্ধের বাজারে দেহব্যাবসাকেই বেছে নেওয়ার কারণ সুঠামদেহী সৈনিকদের সাহচর্য। অর্থ তার প্রয়োজন, কিন্তু বীরত্বমণ্ডিত সৈনিকদের অঙ্কশায়িতা হওয়ার বিষয়টিকেও সে এড়িয়ে যেতে পারে না। এবং এক পুরুষেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না বলেই হয়তো গণিকাবৃত্তি বেছে নেওয়া।পুত্ররূপে পালিতা চিত্রাঙ্গদা রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়েও অর্জুনের দেহসৌষ্ঠব ও বীরত্বে মুগ্ধ হলে, তার পৌরুষভাব লুপ্ত হয়ে তার মধ্যে প্রেমবোধ ও নারীত্ববোধের জাগরণ ঘটে। লেখক মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা আর অর্জুন প্রসঙ্গের উত্থাপন করে এই বাস্তুহারা নারীদের বাস্তুচ্যুত থাকার কারণ হিসেবেও আরও জানান যে, এই গল্পের নারীদের স্থানান্তরের অন্যতম কারণ যোগ্যপুরুষের সঙ্গপ্রত্যাশা। মনোমতো সঙ্গীপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও তাদের

স্থানান্তর ঘটে। অমিয়ভূষণ আলোচ্য গল্পে পুরাণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ঘটনার সঙ্গে একাকার করে তোলেন।

স্বামীসহ স্বগ্রাম-ত্যাগ-করা ডরোথি শেষ পর্যন্ত এই এক পুরুষেই (ব্যালেন্টাইন) সুখী থাকবে কি না সেই বিষয়েও সন্দেহের বীজ বুনে দিতে লেখক জানান যে, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে চোয়ালে আঘাত পেয়ে তার স্বামীর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ডরোথির কাছে তার স্বামীর প্রয়োজন ফুরাচ্ছে। এই ডরোথি ম্যাগদালেনেরই অন্য রূপ। চা-বাগানের নামে নাম দেওয়া ম্যাগদালেনের নাম মূলত তার পদবি,এই পদবি উত্তরাধিকারসূত্রে সে প্রথম জন থেকে প্রাপ্ত; স্বীকৃতি না পেলেও সে প্রথম জন-এর ঔরসজাত। ম্যাগদালেনের মা ভাগ্যের অন্বেষণে চা-বাগানে এলে প্রথম জন তাকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করে এবং ম্যাগদালেনের জন্ম হয়। একইভাবে চা-বাগান থেকে বহুদূরে অবস্থিত নাম্‌চা গ্রামে উদ্বাস্তু হয়ে আসাডরোথির উন্নত নাক, সুউচ্চ গ্রীবা জানান দেয় যে নাম্‌চা গ্রামের প্রাচীন গির্জার প্রতিষ্ঠাতা পাদরিই তার জনক। মাতৃকূল থেকে পাওয়া উদ্বাস্তুচেতনা আর জনককূল থেকে পাওয়া বহুগামিতার সমন্বয়ে নির্ণিত হয় তাদের স্বভাব। অর্থাৎ আরাধ্য ভূমি ফিরে পেলেও তারা স্বভাবত বহুগামিতা ও উদ্বাস্তুচেতনার কারণে তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়তে পারে না। কোনো সুদূরের হাতছানি তাদেরকে আবার ঘরছাড়া করে। এই সুদূরের নানা অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েও তারা আবার পথে নামে।

গল্পের আরেক ভরকেন্দ্র ব্যালেন্টাইন। উদ্বাস্তুজটিলতা ব্যালেন্টাইনের নেই। স্বভাবচঞ্চল ও নারীসঙ্গপ্রিয় হলেও ইঞ্জিনিয়ার ব্যালেন্টাইন চা-বাগানের চাকরি থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান, সর্বক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার পরিচয় রেখেছে। কিন্তু চা-বাগান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে তার মধ্যকার সত্তার পরিবর্তনটিকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়, 'যে জঙ্গলে হরিণও নেই সেটাকেই বাঘের খোঁজে চষে'[২১] বেড়ানো ব্যালেন্টাইন বর্তমানে কোমরে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও হরিণটিকে নিজে শিকার করে না, এমনকি কথককেও শিকার করতে দেয় না। মদ্যপানে অভ্যস্ত ও মাংসাশী ব্যালেন্টাইনের এই পরিবর্তন সামনের বিশাল পরিবর্তনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয়। হুল্লোড়প্রিয়, আমুদে ব্যালেন্টাইনের মুখে উচ্চারিত হয়, 'দেখো বোনার্জি, শান্তি জিনিসটার মূল্য এইসব চুরমার হৈচৈয়ের চাইতে অনেক বেশি।'[২২] সমালোচকের ভাষায়, 'পৃথিবী ছিঁড়ে ছিঁড়ে, বাতাস নিংড়ে ভোরের আনন্দ খুঁজে বেড়ানো যে ব্যালেন্টাইন, তাকে ভাবতে হলো পাহাড়ের বহু নীচে, উপত্যাকার বস্তিটায় যেন শান্তি বিরাজ করছে।'[২৩]

তার আচরণগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবর্তনেরই চূড়ান্ত রূপ তার নিখোঁজ হওয়া এবং পরবর্তীকালে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া। অথচ মৃত্যুর নাটক সাজিয়ে ব্যালেন্টাইন চাকরির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আদিবাসী কোনো এক গ্রামের টেম্মা অথবা ডরোথির সঙ্গে সংসার বেঁধে বেশ ছিল। কিন্তু এই সহজ-সরল গ্রাম্য জীবনেও একসময় একঘেয়েমি এসে গেলে এখান থেকেও সে পলায়ন করতে চায়। এতে অনুমান করা যায়, অমিয়ভূষণের 'অঘটনা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মতো ব্যালন্টাইনও সুদূরের পিয়াসী।

এই নিরন্তর সন্ধান আর যাত্রার অনুষঙ্গ অমিয়ভূষণের এই ধরনের গল্পগুলোতে পুনরাবৃত্ত। ম্যাগদালেন, টেম্মা, ম্যাগী, ডরোথি এরা সকলেই এই যাত্রার যাত্রী। 'কৌলিন্যহীন মানবগোষ্ঠী কুল ও পরিচয় কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।[২৪] গল্পে এই সিদ্ধান্ত এবং সেই কুলপরিচয়ের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাদের এই অনুসন্ধান থেমে যাবে না। উদ্বাস্তুচেতনার কারণে স্থানান্তর এবং মানবজীবন-রহস্য উন্মোচন অর্থাৎ আত্ম-অনুসন্ধান উভয় বিষয়কেই শিল্পসফলভাবে রূপায়ণের কারণে 'সাদা মাকড়সা' অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রতিনিধিত্বশীল গল্পগুলোর অন্যতম।

২.৪

'দুলারহিনদের উপকথা' (২০০৩) গল্পের অন্যতম চরিত্র ভুখনের মাধ্যমে অমিয়ভূষণ আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনার আরেক শিল্পসফল পরিণয় ঘটিয়েছেন। ভুখন আর তার সৎবোন দুলারহিন যে দেশের বাসিন্দা, তার অবস্থান 'সভ্যতার প্রান্তসীমা থেকেও বহু দূরে'। এই দেশেই ভুখন মহিষের পাহারাদার হিসেবে মজুর খাটে। বোন বলে যাকে সে ছোটবেলা থেকেই আপন জেনেছে, সে তার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রবধূ। ভুখনের পিতা ও সৎমায়ের মৃত্যুর পনেরো বছরের মধ্যে দুলারহিনের বসন্ত রোগ ছাড়া আর কোনো জটিল সমস্যায় তারা পড়েনি। অর্থকষ্ট, অন্নকষ্ট ইত্যাদি নৈমিত্তিক বিষয়গুলোকে তারা গাঁয়ের বাকি মানুষদের মতো স্বাভাবিক জ্ঞান করেছে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল পনেরো বছরের ব্যবধানে, বোনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে গিয়ে যখন দুলারহিন ভুখনের বিয়ের দায়িত্ব নিতে চাইল। কিন্তু সেটা যে অনায়াসলব্ধ নয়, তা পাঠক ক্রমে অবগত হয়। ভারতবর্ষের নাম-না-জানা সেই দেশে ছেলেদের বিয়ে করতে হয় যৌতুকের বিনিময়ে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক— সংসারের ইত্যাকার টানাপড়েনের মধ্যেও দুলারহিন তার ভাইকে বিবাহিত ও সংসারী দেখতে চায়। যৌতুকের টাকা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে উপায়ন্তর না দেখে নিজে বিয়ে করে অর্থ-উপার্জনের মাধ্যমে ভাইয়ের বিয়ের সমাধান খুঁজে নেয় দুলারহিন।

নিজের বর খোঁজার উদ্দেশ্যে পথে নেমে ব্যর্থ হয় সে। ভীত-সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত বোনকে ভাই-ই খুঁজে পায় প্রথম বার। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর খুঁজে পাওয়া গেল না দুলারহিনকে, যদিও বোনের খোঁজে ভুখন ঘরছাড়া। অবশ্য পরের বার ঘর থেকে বেশি দূর যেতে হয়নি দুলারহিনকে। পথেই এক বৃদ্ধ অর্থের বিনিময়ে তার বাড়িতে গরু-বাছুর তদারকির কাজে নিযুক্ত করে তাকে। কিন্তু কোনো এক রাতে বৃদ্ধের পুত্রের দ্বারা ধর্ষিত হলে বৃদ্ধই তার সম্ভ্রমের বিনিময় ঘটিয়ে দেয় আশি টাকায়। লেখকের বর্ণনায়:

> সেই বুড়োর কাছে থাকতে-থাকতে বুড়োর ছেলে একদিন কেড়ে নিল দুলারহিনকে। বুড়ো খুব হুঁশিয়ার, সে ছেলে বলে রেয়াত করল না, টাকা নিল চার কুড়ি ছেলের কাছে বুঝে। সে টাকা আঁচলে বেঁধে বুড়োর ছেলের ঘর করছে দুলারহিন।[২৫]

ভাইয়ের অপেক্ষা করতে করতে দুলারহিন বৃদ্ধের ছেলের সংসার করে, তিন-চারটি সন্তানের মা হয়। আর মানুষের কাছে খবর দেয় ভুখন যেন ঘরে ফিরে। ভাই ঘরে ফিরলেই সেও ফিরে যাবে।

কিন্তু একসময় দুই কুড়ি টাকাতেই যে ভাইকে সে বিয়ে করাতে পারত, আজ চার কুড়ি পুঁজি নিয়েও সে ভাইয়ের সন্ধান পায় না। এদিকে হারানো বোনকে খুঁজতে গিয়ে ভুখন নিজেই হয় উদ্বাস্তু। লেখকের বর্ণনায় :

> হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেল। ততদিনে সে বহুদূরে এসে পড়েছে। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ক্ষেতির কাজ করে আবার হাতে পয়সা করে বেরুতে গেলে দুলারহিনকে বোধহয় আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। তখন সে পথ চলতে চলতে কাজ করতে শুরু করল।... কাজ ফুরিয়ে গেলে চলতে শুরু করে।... এক চায়ের বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর একনাগাড়ে খাটতে হয়েছিল, পথ চলবার উপায় ছিল না। ভুখনের ধারণা, সেই সময়েই দুলারহিন সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়েছে।... হাজার মেয়ে পুরুষ নাকি মরিসাস দ্বীপে কাজ করতে গেছে। ভুখনের ইচ্ছা সে একবার মরিসাস দ্বীপটিও খুঁজে আসবে।[২৬]

ভাই আর বোনের একে অপরের প্রতি এমন বাৎসল্যের নমুনা বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। তাদের কোনো অবদানই অপরের কোনো কাজে আসে না। এই ভাইবোনের একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার অভাব নেই। কেবল তাদের সারল্যের কারণে এই ভালোবাসার প্রায়োগিক কোনো মূল্য থাকে না। সারল্যের দিক থেকে বিচার করলে গল্পটিকে শহীদুল জহিরের 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' (২০০৭) গল্পের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং ভুখনের ভগ্নি-অন্বেষণ তার অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে গল্পটি গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের 'আমি শুধু একটি ফোন করতে এসেছিলাম' (১৯৯২) গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। প্রেক্ষাপট ও উৎকর্ষের ব্যবধান থাকলেও সারল্য ও অভ্যাসকে প্রেক্ষণবিন্দুতে রেখে এই তুলনা যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারে।

বাৎসল্যরসে সিক্ত হয়ে এই গল্পে প্রথম পর্যায়ে স্থানান্তর ঘটিয়েছে দুলারহিন। ভাইকে বিয়ে করানোর জন্য সে ঘর ছেড়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থানান্তর এসেছে ভুখনের মাধ্যমে— হারিয়ে যাওয়া বোনকে খুঁজতে গিয়ে সে উদ্বাস্তু মানবে পরিণত হয়। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের স্থানান্তরও ঘটে ভুখনের মাধ্যমে, যা ক্রমশ তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। দুলারহিনের সংসারে শিকড় গেঁথে যাওয়া এবং ভুখনের বোহেমিয়ান জীবন—এই দুই জীবনের ব্যবধান লেখকের ভাষায়, 'বলো দেখি যে-ব্যবধান এসে গেছে তাদের জীবনে সে কি মরিসাস দ্বীপের সাগরের চাইতে কম দুস্তর?... তাকে কখনও ফিরিয়ে আনা যায়— পারত তাই ভুখন, যদি জানতও সে? তার চাইতে মরিসাসের দূরত্ব-কল্পনাও ভালো।'[২৭] ভুখন এখন আর দুলারহিনকে খুঁজে বেড়ায় না। বোনকে খোঁজার অভ্যাস বাদ দিয়ে নিজের অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া ভুখন নিজেও জানে না আসলে সে কী চায়। ভুখনের নতুন অভ্যাস দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ানো, শহর বদলে-বদলে কাজ করা, লেখক যাকে আপাতত 'নেশা' বলেছেন। তার এই ক্রম-স্থানান্তর যে দুলারহিনকে খোঁজার জন্যও তা জানাতে লেখক কার্পণ্য করেন না। নইলে, 'সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জ্বেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানোর গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোনো-কোনো দিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে'[২৮] থাকবে কেন ভুখন?

এই অন্ধকার তার জীবনের শূন্যতার রূপক। সহকর্মীদের সঙ্গে দেশের আলোচনায় অংশগ্রহণ না করার মূলে থাকে'হৃদয় খুঁড়ে' বেদনা জাগানোর অনিচ্ছা। এখন ভুখনের গ্রামে তার আর আপন

কেউ নেই।অন্ধকার আকাশ একদিকে যেমন তার অন্ধকার ভবিষ্যতের প্রতিফলক, অপরদিকে বর্তমানের হাহাকারকে পাশ কাটানোর প্রচেষ্টা। বোনকে খোঁজা বাদ দিলেও হৃদয়ে বোনের উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারে না ভুখন। রমাপ্রসাদ নাগের বক্তব্য অনুযায়ী, 'ভুখনের জীবনের ধ্রুবতারা দুলারহিন্। তারই পথ চেয়ে তার দিন যাপন, অন্ধকার আকাশের প্রসারতা কল্পনা করা। মনের সুপ্ত আলোটা ভুখনের মনে বিস্তৃত করে যেন একটা গল্পের মাঝে বেঁচে থাকবে দুলারহিন্।'[২৯]

তেমনই সংসারের বেড়াজালে আবদ্ধ দুলারহিনের শূন্যতাও শীতের অন্ধকারে তার হৃদয়মূলকে শিথিল করে দিয়ে ভাইয়ের জন্য হাহাকারে বিদীর্ণ করে। রক্তের সম্পর্কহীন দুটি ভাইবোনের একে অন্যের প্রতি মমতার টানে একে অন্যের ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা, একসঙ্গে সুখী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উভয়েরই ক্রমে দূরে সরে যাওয়া গল্পটিতে এক শূন্যতাবোধের আমেজ ছড়িয়ে দেয়, লিখনশৈলীর গুণে যা মহৎ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে পাঠককে মনে করিয়ে দেয় কীভাবে বরিস পাস্তেরনাকের (১৮৯০-১৯৬০) *My Sister, Life* (১৯৭৮), আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) 'জীবন আমার বোন' (*জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*, ১৯৬৭) আর মাহমুদুল হকের (১৯৪১-২০০৮) *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬) 'দুলারহিনদের উপকথা'র সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

২.৫

অমিয়ভূষণ মজুমদারের কিছু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো গতানুগতিক জীবন যাপনে হাঁপিয়ে ওঠা এবং পরবর্তীকালে কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। এরা জগতের এমন এক সুদুরনিমগ্ন সত্তা, হাঁপ-ধরা জীবন যাদের নিরুদ্দেশযাত্রার অজুহাতমাত্র। এই সুদুরপিয়াসার নেপথ্যকারণ তাদের আত্ম-অনুসন্ধান। তেমনই এক চরিত্র 'অঘটনা' (২০০৩) গল্পের চিত্রার স্বামী। স্ত্রী-পুত্র-মাতা নিয়ে তার টানাপড়েনের সংসার হলেও সেখানে স্বস্তির অভাব ছিল না। দূরসম্পর্কের ভাই অশোকের হঠাৎ আগমনে প্রথমদিকে আপত্তি থাকলেও পরবর্তীকালে তাকে সংসারের একজন ভেবে আপন করে নিয়েছিল সপরিবারে। অশোকও তার প্রতিদান দিয়েছে সাধ্যমতো। এদের এতদিন ঠিকঠাক সব মতোই চলছিল সেই অঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত, যেদিন চিত্রার স্বামী আর বাড়ি ফিরল না। তার উধাও হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। লেখকের এই পর্বের অন্যান্য গল্পের মতো লোকটির উদ্বাস্তু-সমস্যা ছিল না। ছিল না কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের হানাহানি, কাঁটাতারের বাঁধন, স্বৈরতন্ত্রের রক্তচক্ষু। সবচেয়ে বড় বিষয়, তার সাংসারিক অশান্তি ছিল না। তারপরও সে নিরুদ্দেশ হয়। কারণ হিসেবে তার যাযাবরমনোবৃত্তিকেই চিহ্নিত করা যায়। গতানুগতিক দাম্পত্যে ক্লান্ত হয়েও সে গৃহত্যাগী হতে পারে। এই বৈরাগ্যের নেশা এতই তীব্র ছিল যে বিধমা মা, স্ত্রী আর অবুঝ সন্তানদের দায়িত্ব কিংবা মায়ার বাঁধনও তাকে পিছু হটাতে পারেনি। সে পথের ডাক শুনেছে, পথে নেমেছে। আবার 'সাদা মাকড়সা'র ব্যালেন্টাইন কিংবা ম্যাগীদের মতো পথে নামার বহু বছর পর তার মনে হয়েছে, পথ নয়, ঘরই তার প্রকৃত ঠিকানা,

তাই ফিরে আসতে চেয়েছে। যদিও ধারণা করা যায়, ঘরও তাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারত না। সাহিত্যে এই উদ্বাস্তু-মনোবৃত্তির রূপায়ণ সম্পর্কে জন জেকব ক্লেটনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

> Most Novelists tell one fable again and again—some more obviously than others. Their fable is not at all the story of the novelist's life; indeed, it maz not even be the record of his personality. His acuintances may not recognise it as in any way connected to the man. It is the story of an important, possibly unresolved, portion of the writer's psychic life projected into fiction. If the writer is in touch with himself, this fable will be extremely close to the psychic lives of most of us.[৩০]

অমিয়ভূষণও এইভাবে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের উদ্বাস্তুচেতনাকে রূপায়িত করেছেন।

চিত্রার স্বামীর প্রত্যাবর্তনের কারণটি নানান দ্বান্দ্বিকতায় আকীর্ণ। চেহারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে চিহ্নিত করা যায়নি, এবং সেও পরিচয় স্পষ্ট করেনি বলে এই পরিবারে তার আশ্রিত হিসেবে পুনরায় স্থান হয়। তার এই প্রত্যাবর্তন শেকড়ে ফেরার তাগিদেই কি না গল্পে তার কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। তবে মূলের টান যে ছিন্ন করতে পারেনি সে, চিত্রাদের উপাধি পরিবর্তনের সংবাদে তার চমকে ওঠার সময় তা বোঝা যায়, এমনকি ছোট ছেলের অসুখের সংবাদে দারোয়ানের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েও বারবার তার তত্ত্বতালাশে তার মর্মপীড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিত্রা যাকে 'অদ্ভুত স্নেহপ্রবণ' বলেছিল, সেটিই তার শেকড়ের টান। অজানালোকের টানে স্বেচ্ছায় ভাসমান জীবন বেছে নেওয়া চিত্রার স্বামী আবার ঘরে ফিরতে চেয়েছে, কিন্তু ফিরে এসে বুঝতে পেরেছে কাটা শেকড় জোড়া দেওয়া অসম্ভব। আর তাই আশাহত হয়ে ফিরে গেছে আবার নিরুদ্দেশের পথে। সে যে এসেছিল তার চিহ্ন রেখে গেছে বালিশের নিচে যত্ন করে রাখা বহু বছরের পুরোনো পত্রিকার ভাঁজে, '২৬শে জানুয়ারির সংকল্প আছে একটিতে, তার চাইতেও পুরনো একটিতে বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের খানিকটা। উল্টোপিঠে কে-একজন দাদা হারিয়ে গেছে, আর তার ছোটভাই অশোক তাকে খুঁজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।'[৩১]

তবে সুযোগ থাকলেও চিত্রার স্বামী আদৌ এই পরিবারে আবার থিতু হতে পারত কি না তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। সুদূর পথের হাতছানিই তাকে ঘরছাড়া করেছিল। শেকড়ের টানে মাঝপথে ফিরে এলেও চেতনার গভীরে প্রোথিত এই মানসিকতা তাকে স্থির হতে দেবে না, সেটা হয়তো সে জানত। নিজ সংসারকে অন্যের হতে দেখে সে যেমন বেদনাহত হয়েছে, তেমনই পথের ডাককেও যে সে উপেক্ষা করতে পারবে না— এটাও তার অজ্ঞাত ছিল না। আর তাই, যেতে হবে জেনেই, তার আবার বহির্গমন।

৩

অমিয়ভূষণের গল্পের এই যে উদ্বাস্তু-মনোবৃত্তি, নিরন্তর আত্ম-অনুসন্ধান কিংবা আত্মজিজ্ঞাসা ও স্থানান্তরের অন্তরালে যেমন ক্রিয়াশীল থাকে যুদ্ধবিধ্বস্ত গোটা পৃথিবী, তেমন এর আরেক

নেপথ্যচালিকাশক্তি মানুষের যাযাবরমনোবৃত্তি, পথের নেশা, দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কোনো-কোনো গল্পে স্থানান্তর এসেছে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়। কোথাও-কোথাও জীবনবাদ ও জীবনাকাঙ্ক্ষা চরিত্রদের পথে নামিয়েছে। সেই পথে তারা নানান প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, তবু তারা হাল ছাড়েনি। হার-না-মানা এবং মেনে নিতে না পারার অর্থাৎ আপোসহীন মনোবৃত্তির কারণে কোথাও তারা স্থায়ী আবাস গড়তে পারেনি। বর্তমানের স্থিতিশীলতা এবং স্বস্তির জীবনের মধ্যে যখনই তারা অতীত-জীবনের অন্ধকারের পুনরাবৃত্তির আভাস পেয়েছে, তখনই আবার পথে নেমেছে। কারও মৃত্যু, কারও দলত্যাগ, কারও ফিরে যাওয়া— কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। অমিয়ভূষণের কিছু গল্পে স্থানান্তর এসেছে উদ্বাস্তুচেতনা ও আত্ম-অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর কিছু চরিত্র অন্তশ্চৈতন্যের বৈরাগ্য নিয়েই পথে নেমেছে সংসারের মায়া ত্যাগ করে। গতানুগতিক জীবনের বৈক্লব্য ও হাঁপ-ধরা ছকে-বাঁধা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এই যাত্রার কারণ হতে পারে। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে এই যাত্রা কোনো পূর্ণতার সন্ধানে। কিন্তু দেখা যায়, তারা শেষ পর্যন্ত সেই পূর্ণতার সন্ধান পেলেও, ফেলে যাওয়া অপূর্ণ জীবনের প্রতিও তাদের পিছুটান রয়ে গেছে। তারা ফিরে আসে, আবার ফিরে যায়। কেননা চেতনার দিক দিয়ে এই মানুষেরা পিতৃভূমির খোঁজ কিংবা আত্মপরিচয়ের সন্ধান পেলেও সেই পরিচয় তাদের তুষ্ট রাখতে পারে না। পৃথিবীর চলিষ্ণুতায় সমর্পিত এই মানুষেরা শেকড়-কাটা ও শেকড়ে-ফেরা— এই আগমন-বহির্গমনের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত নিজেদের খুঁজে বেড়ায়। আত্ম-অনুসন্ধান, স্থানান্তর ও উদ্বাস্তুচেতনা প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণের এই গল্পগুলো কেবল তাঁর গল্পেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ও রসোত্তীর্ণ গল্প হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. বরেন্দু মণ্ডল, 'অমিয়ভূষণের কয়েকটি অচেনা গল্প', *এবং মুশায়েরা*, অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪, (সম্পা: সুবল সামন্ত), কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৭৪

২. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'অ্যাভলনের সরাই', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৬

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৫. তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইতিহাসের সীমা ছুঁয়ে অমিয়ভূষণ', *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬১, সংখ্যা ২ (সম্পা: আবদুর রাউফ), কলকাতা, ১৪০৮ ব., পৃ. ১১১

৬. মৃদুল ঘোষ, 'অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর ছোটগল্প: সৃজন ও নির্মাণের পৃথক পৃথিবী', পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ২০০৯, পৃ. ৩১

৭. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'অ্যাভলনের সরাই', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৯. রমাপ্রসাদ নাগ, 'সাহিত্য কর্মের বিষয় বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ উদ্বাস্তু চেতনা', *স্বতন্ত্র নির্মিতি: অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬৭

১০. Gabrial Josipovice, *Literature and Criticism*, June 24-30, TLS, 1988, p. 695

১১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'উরুণ্ডী', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬১
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
১৪. রমাপ্রসাদ নাগ, 'সাহিত্য কর্মের বিষয় বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ উদ্বাস্তু চেতনা', *স্বতন্ত্র নির্মিতি: অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬১
১৫. মৃদুল ঘোষ, 'অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর ছোটগল্প: সৃজন ও নির্মাণের পৃথক পৃথিবী', পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ২০০৯, পৃ. ৩৩
১৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'উত্তরাধিকার ৪: ১ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৪', *কথা বলতে বলতে*, (সম্পা: এণাক্ষী মজুমদার), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৩৬
১৭. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'সাদা মাকড়সা', *রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২২৫
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
২৩. মৃদুল ঘোষ, 'অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর ছোটগল্প: সৃজন ও নির্মাণের পৃথক পৃথিবী', পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ২০০৯, পৃ. ২১৪
২৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'সাদা মাকড়সা', *রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২১৩
২৫. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'দুলারহিনদের উপকথা', *রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৭৮
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
২৯. রমাপ্রসাদ নাগ, 'অমিয়ভূষণের সাহিত্যে নারী', *স্বতন্ত্র নির্মিতি: অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১২
৩০. Clayton, John Jacob, 'Chapter 7', *Saul Bellow's In Defence of Man*, 1st edition, Indiana University Press, United States, 1996, p. 43
৩১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'অঘটনা', *রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৮৭